ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয় কারো 'পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৩ বর্ষ | ২২তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ ২৭ জমা. সানি, ১৪৩২ হিজরি ৩১ হিজরত, ১৩৯০ হি. শা. ৩১ মে, ২০১১ ঈসাব্দ

Masjid Nasir Hartlepool, UK | মসজিদ নাসের হার্টলপুল, ইউ.কে

"বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।"

"যে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সাথে পাঁচওয়াক্ত নামায পড়ে না, সে আমার জামা'তভুক্ত নহে।"

-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org;www.mta.tv

Amecon Since 1985

www.amecon-bd.net

Our Activities

Crest
Trophy
Sign Board
Metal Sign
Acrylic Letter
POP & Interior
Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

শুভ বুদ্ধির উদয় হোক রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকদের

mPxc Î

অর্থনৈতিক মন্দাভাব থেকে উত্তরণের উপায়ান্তর না পেয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সংঘটিত হয়েছে ও হচ্ছে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে দিকদর্শী নির্দেশনা দিয়েছিলেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। তিনি (রাহে.) বলেন,

"অর্থনৈতিক সুবিচার একটি চমৎকার শ্লোগান। যেহেতু, অন্যান্য সবাইকে বাদ রেখে বিষয়টাকে একচেটিয়া করে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালান হয়, সেহেতু এই শ্লোগানটি মুক্ত বাজার অর্থনীতির পুঁজিবাদী সমাজেও যেমন, তেমনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক সামাজিক মতবাদেও সমভাবেই উচ্চারিত হয়। আর উভয়পক্ষ সুবিচারেরই কথা বলে। কিন্তু বাস্তবতা হলো উভয়পক্ষই 'অর্থনৈতিক সুবিচার'-এর সোনালী নীতির প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে।.....

ইসলাম এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলে, যাতে সরকারগুলোকে এবং বিত্তবানদেরকে বার বার মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, তাদের নিজেদেরই স্বার্থে তাদেরকে একটি সুষম অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদেরকে বারবার এই উপদেশও মেনে চলতে বলা হয়েছে যে, তারা যেন অন্যান্যদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে। দুর্বল ও দরিদ্রকে যেন তাদের মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার থেকে কখনোই বঞ্চিত রাখা না হয়। তাদের প্রত্যেকের পেশা পসন্দ করবার স্বাধীনতা, সুযোগ-সুবিধার সমান প্রাপ্যতা এবং জীবনধারণের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার থাকতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে মানবেতিহাসে ইতোমধ্যেই মন্দা থেকে উত্তরণের জন্য সংগ্রামের পথে বহু দুঃখ-বেদনা এবং বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

এ কারণেই, ইসলামে 'নেওয়ার' বা 'রাখার' চাইতে অধিক জোর দেয়া হয়েছে 'দেওয়ার' উপরে। সরকারগুলোকে এবং বিত্তশালীদেরকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সমাজে যেন এমন কোন অংশ থেকে না যায়, যারা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকবার মৌলিক মানবাধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত। একটি প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রকে, তার প্রয়োজন কি, তা জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং পূরণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। দুঃখ-যন্ত্রণার আর্তনাদ প্রতিবাদে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বেই এবং প্রয়োজন বা চাহিদার কারণে শান্তি ও শৃংখলা বিপর্যস্ত হওয়ার পূর্বেই দুঃখ-যন্ত্রণার কারণসমূহ দূরীভূত করতে হবে এবং প্রয়োজনসমূহ মেটাতে হবে।"

(`Islam's Response to Contemporary Issues`)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) প্রদত্ত উপরোক্ত নির্দেশনার প্রতি আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেবেন, নাকি স্বার্থপরতার যূপকাষ্ঠে বলি দেবেন বিশ্ব-মানবতাকে। দেখবার বিষয় এখন সেটাই।

৩১ মে ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
জুমুআর খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলামি শিক্ষা মওলানা বশিরুর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলাহ	১১
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি	১৪
এই ঈসা (আ.) খ্রিষ্টানদের নবী সেই ঈসা (আ.) নহেন সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১৫
সম্পদের সন্ধানে কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	১৭
সন্ত্রাসবাদীদের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই মাহমুদ আহমদ সুমন	২০
দৈনন্দিন জীবনে দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২২
আল্লাহ্ পাকের দাসত্ব প্রসঙ্গে খালিদ আহমেদ সিরাজী	২৪
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ অনুষ্ঠিত 'সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট'	২৫
নবীনদের পাতা- আসুন! আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরি আনোয়ার আহমদ	২৮
পাঠক কলাম	৩১
সংবাদ	৩৩

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ﴿٥٥﴾

৫৫। আর বাদশাহ্ বললো, 'তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। আমি তাকে নিজের (বিশেষ কাজের) জন্য বেছে নিব।' অতএব সে যখন তার সাথে আলাপ করলো তখন সে (ইউসুফকে) বললো, 'নিশ্চয় আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে অতি মর্যাদাবান (ও) বিশ্বস্ত।'

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٦﴾

৫৬। সে (অর্থাৎ ইউসুফ) বললো, 'তুমি আমাকে দেশের ধনভান্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত কর। নিশ্চয় আমি উত্তম রক্ষক[১৩৯০] (এবং এ বিষয়ে) জ্ঞানী।'

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ؕ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। আর এভাবেই আমরা ইউসুফকে সে দেশে অধিষ্ঠিত করেছিলাম। সে যেখানে চাইতো সেখানে অবস্থান করতো। আমরা যাকে চাই আমাদের কৃপায় ভূষিত করে থাকি। আর আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান বিনষ্ট হতে দেই না।

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করেছে পরকালের পুরস্কার তাদের জন্য (হবে) উত্তম।

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। আর ইউসুফের ভাইয়েরা এল এবং তার কাছে উপস্থিত হলো। সে তাদের চিনতে পারলো, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না।

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। আর সে যখন তাদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে দিল তখন সে বললো, 'তোমাদের পিতার[১৩৯০-ক] দিক থেকে তোমাদের যে এক ভাই আছে তাকে নিয়ে আস। তোমরা কি দেখছ না, আমি (শস্য-বরাদ্দ) নিশ্চয় পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম অতিথি সেবক?

فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿٦١﴾

৬১। আর তোমরা তাকে আমার কাছে না নিয়ে এলে তোমাদের জন্য আমার কাছে (শস্যের) কোন পরিমাণ (বরাদ্দ) থাকবে না এবং তোমরা আমার কাছে (আর) এসো না।'

১৩৯০। ইউসুফ (আ.) খাজাঞ্চিখানা বা অর্থ দপ্তরের কাজ পছন্দ করলেন। তাঁর উক্ত পছন্দ সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই ছিল যাতে তিনি এই দপ্তর পরিচালনায় একাগ্রতার সাথে মনোনিবেশ করতে পারেন যার সাথে বাদশাহ্‌র স্বপ্ন সত্যে বাস্তবায়িত হওয়া গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল।

১৩৯০-ক। হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বারজন পুত্র ছিল। যোসেফ ও বেনজামিন এই দুই পুত্র তাঁর স্ত্রী রাহেলের গর্ভজাত এবং বাকী দশ জন পুত্র অন্য স্ত্রীদের সন্তান।

হাদীস শরীফ

বল প্রয়োগ করে ইসলাম প্রচার করা নিষিদ্ধ

কুরআন :
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন "ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে; সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মজবুত করে ধরেছে যা কখনও ভাঙ্গবার নয়।" (সূরা বাকারা : ২৫৭)

হাদীস :
হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতফা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল! শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না, বরং আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করো এবং মুকাবেলা হলে ধৈর্য ধারণ করো। (বুখারী-কিতাবুল জিহাদ।)

হযরত সাঈদ ইবনে আবু বুরদাহ তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) হযরত মুয়াজ (রা.) ও হযরত আবু মুসা (রা.)-কে ইয়মেনে প্রেরণের সময় উপদেশ দান করলেন, "তোমরা লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজ করবে, কষ্টদায়ক কাজ করবে না, আশার বাণী শুনাবে, নৈরাশ্যজনক কথা বলে বীতশ্রদ্ধ করবে না এবং ঐকমত্য সহকারে কাজ করবে; মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না।" (বুখারী-কিতাবুল জিহাদ)

"ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে"

এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন–
"কুরআন করীমে পরিষ্কার আদেশ রয়েছে যে, ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করো না বরং ধর্মের সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পেশ কর এবং নেক নমুনা ও উত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর। এ ধারণা পোষণ করো না যে, শুরুতে ইসলামে তলোয়ার চালাবার আদেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা সেই তলোয়ার দ্বীনকে বিস্তার দানের উদ্দেশ্যে চালান হয় নি, বরং শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করার কিংবা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই চালানো হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না।" (সিতারা-ই-কায়সারিয়া)

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের উদ্দেশ্য

আমি স্বপ্নে দেখছি যে, লোকেরা এক জীবনদাতাকে খুঁজছে। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার সামনে উপস্থিত হল এবং আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল 'হাযা রাজুলুন ইউহিব্বু রাসূলাল্লাহ্' অথাৎ ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)কে ভালবাসেন। এ কথার অর্থ, (আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যের) পদ লাভের জন্য বড় শর্ত হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ভালোবাসা, যা এই ব্যক্তির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। (রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ৫৯৮ পৃষ্ঠা)

দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করতে পারে না, কেননা আমি দুনিয়া হতে নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক জগতের অংশ প্রদান করা হয়েছে তারা আমাকে গ্রহণ করেছে ও করবে। আমাকে যে ত্যাগ করে, সে তাঁকে ত্যাগ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমার সাথে যিনি সংযোগ স্থাপন করেন, তিনি তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করেন যাঁর নিকট হতে আমি এসেছি। আমার হাতে এক প্রদীপ আছে। যে ব্যক্তি আমার নিকট আসবে সে অবশ্যই সেই আলো হতে অংশ লাভ করবে কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণাবশতঃ দূরে সরে পড়বে সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে।

এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমা'তে প্রবেশ করবে, সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু হতে নিজ প্রাণ বাঁচাবে। (রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা)

আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কুরআনের রহস্য ও তত্ত্বজ্ঞানে আমাকে সকল মানবাত্মার উপর প্রাধান্য দান করা হয়েছে। আমি কুরআন শরীফের তফসীর লিখতে বার বার প্রতিযোগিতার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছি। যদি কোন বিরুদ্ধবাদী মৌলভী এটি গ্রহণ করত তা হলে খোদা তাআলা অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতেন। সুতরাং কুরআনের যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান আমাকে দান করা হয়েছে এটি আল্লাহ্‌র এক নিদর্শন। আমি খোদার ফযল হতে আশা রাখি যে, শীঘ্র দুনিয়া দেখে নিবে, আমি সত্যবাদী। (রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

আমি নি:সঙ্গ নই, বরং সম্মানিত খোদা আমার সাথে রয়েছেন। সেই খোদা হতে আমার নিকটতর আর কেউ নেই। তাঁর কৃপাতেই আমি এক প্রাণপূর্ণ আত্মা পেয়েছি যেন দু:খ সহ্য করেও তাঁর ধর্মের সেবা করতে পারি এবং ইসলামী আন্দোলনকে পূর্ণ উদ্দীপনা ও সত্যতার সাথে পূর্ণ করতে পারি। এ কাজের জন্যই তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। এখন আমি কারও বাধা দানে ক্ষান্ত হওয়ার নই। (রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা)

এক মুত্তাকী ব্যক্তির (আমাকে চেনার) জন্য এটাই যথেষ্ট যে, খোদা তাআলা আমাকে ধ্বংস করেননি, যেভাবে তিনি কোন প্রতারককে ধ্বংস করেন। আমার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দেহ ও আত্মার ওপর এত অনুগ্রহ করেছেন যা গণনাতীত। আমি খোদার তরফ হতে ওহী ও ইলহাম প্রাপ্তির দাবী তখন করেছিলাম যখন আমি যুবক ছিলাম আর এখন তো আমি বৃদ্ধ। আমার এই দাবীর পর বিশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন বয়সে আমার চেয়ে যারা ছোট ছিল তারা গত হয়েছেন এবং তিনি আমাকে দীর্ঘায়ু দান করেছেন। আমার প্রত্যেক বিপদের সময় তিনি আমার পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু থাকেন। অতএব এক প্রতারকের কখনও এ বৈশিষ্ট্য হতে পারে কি? (রূহানী খাযায়েন, ১১তম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)

জুমুআর খুতবা

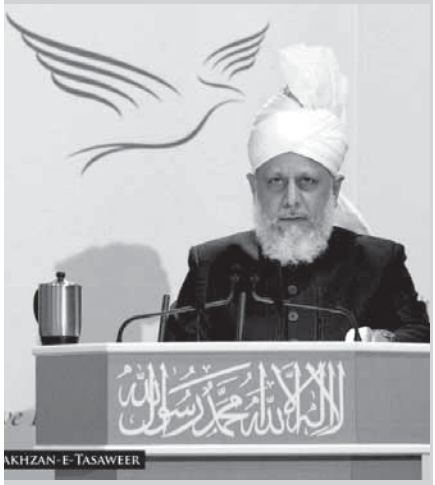

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২৪শে ডিসেম্বর, ২০১০-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ آمين

আমি নিজের স্মৃতিতে রাবওয়ার জলসার জাঁকজমক ও পুত পবিত্র পরিবেশকে নিয়ে চিন্তা করি, খোদা তাআলার তকদীরকে যা আহমদীয়াতের বিজয়ের তকদীর, এটা নিয়ে চিন্তা করি, আর এটাই প্রত্যেক আহমদীর কাজ।

ঐ তকদীর যা মহানবী (সা.)-কে, মহানবী (সা.)-এর ধর্মকে জগতে বিজয়ী করার তকদীর। যেটা মুহাম্মদী মসীহ্র জামা'তের সাথে জগতের অধিকাংশ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার তকদীর।

তাশাহ্হুদ, তা'উয তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) এ আয়াত তেলাওয়াত করেন–

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

(সূরা বাকারা : ১৮৭)

ইনশাআল্লাহ্ দু'দিন পর ২৬ ডিসেম্বর হতে কাদিয়ানে সালানা জলসা শুরু হবে। আল্লাহ্ তাআলা এ জলসাকে সব দিক থেকে বরকত মন্ডিত করুন। উপমহাদেশ বিভাজনের পর কয়েক বছর কাদিয়ানের জলসা বিস্তৃত ও ব্যাপক আকারে হয়নি, যে রকম ১৯৪৭ সালের পূর্বে হত। কিন্তু গত দুই দশক থেকে আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এটা অনেক বড় আকার ধারন করেছে। ১৯৯১ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) সফর করেন ব্যাপক সংখ্যায় লোক আসেন। এরপর থেকেই বেশি বেশি লোক আসা শুরু হয়েছে। পরে ২০০৫-এ যখন আমি গিয়েছি সে সময়ও ব্যাপক সংখ্যায় এসেছে।

এরপর খোদা তাআলার ফযলে উপস্থিতি বাড়ছে। যদিও এত হয়নি যত ২০০৫-এ হয়েছিল। কিন্তু তারপরও বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। গত কয়েক দিন থেকে কাদিয়ান জলসার ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে রিপোর্ট ইত্যাদি আসছিল। এ রিপোর্ট দেখে রাবওয়ার জলসার চিত্রও সামনে চলে আসে। আজ থেকে ২৭ বছর পূর্বে এদিন রাবওয়া ও পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ দিন হত। যেদিন রাবওয়াতে সর্বত্র জলসার ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি চলত। সর্বত্র উৎসাহ, উদ্দীপনা দৃষ্টিগোচর হত। আহমদী স্কুল যেগুলো রাবওয়াতে রয়েছে সেগুলোতে অফিসার জলসা সালানার পক্ষ থেকে ডিউটি ফরম প্রত্যেক আহমদী ছাত্রকে পাঠানো হত, তারা এটা পূরণ করতো তারা কোথায় ডিউটি দিতে চায়। জলসার ব্যবস্থাপনার জন্য কোন স্থানে কোন বিশেষ প্রয়োজন না হলে তারা সাধারনভাবে বাচ্চা ও যুবকদেরকে তাদের পছন্দমত জায়গায় ডিউটি লাগাতেন। ডিউটি নিজের ইচ্ছায় লাভ হোক অথবা জলসার ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হোক, যুবকদের মাঝে সেবা প্রদান ও ডিউটি দেয়ার এক আশ্চর্য আবেগ পরিলক্ষিত হত। ২৭ বছরের এক প্রজন্ম, যাদের জন্ম হয়েছে তারা এখন পূর্ণ যুবক।

আর যারা যুবক ছিল তারা আনসারুল্লাহ্র অন্তর্ভুক্ত বরং সম্ভবত আনসারুল্লাহ্র ৫৫ বছরের উর্ধ্বে সফে আওয়াল চলে গেছেন। বাচ্চা যারা যুবক হয়েছে তাদের হয়ত ডিউটির অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি নেই। আর হতে পারে না কেননা সেখানে জলসা হচ্ছে না। অথবা কেবল সেই সব ঘরগুলো ব্যতিত যাতে জলসার আলোচনা হয়। বরং আমি আশা করি রাবওয়ার যেসব পুরাতন ঘর রয়েছে, পুরাতন অধিবাসী, তাদের মাঝে

জলসার আলোচনা হতেই থাকে। আর যদি না হয় তাহলে হওয়া আবশ্যক যেন নব প্রজন্মের আর আগত প্রজন্মের মাঝে এর প্রতি আবেগ অম্লান থাকে। এটা এজন্য নয়, নতুন প্রজন্ম পরিতাপ করবে বরং এজন্য যে, নতুন প্রজন্ম তাদের মাঝে একটা দৃঢ় প্রত্যয় জাগিয়ে তুলবে। নিরাশ হবে না বরং একটা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাতে সাময়িক এ বাধ্যবাধকতা আমাদের প্রেরণাকে মারতে পারবে না। আমাদের নিরাশ করতে পরবে না। আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে ঝুকা ও তাঁর সাহায্য যাচনা থেকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না। আমাদের ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না যে, এ দিন আমরা পুণরায় দেখার সৌভাগ্য পাব কিনা–যখন প্রত্যেক বাচ্চা, বৃদ্ধ, যুবক এক উদ্দীপনা ও উৎসাহ নিয়ে জলসার প্রস্তুতি ও ডিউটিতে অংশগ্রহণ করত। যখন জলসার প্রত্যেক শ্রোতা নিজের আত্মাকে সিক্ত করত। এ বিষয়টি নতুন প্রজন্মের অর্থাৎ যাদের জন্ম পরে হয়েছে তাদেরও জানানো দরকার। বরং বিগত ১৫/১৬ বছরে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে তারাও এখন যুবক হয়ে গেছে। তাদেরও জানানো দরকার জলসার দিন কেমন হত? রাবওয়া তখন এক গরীব বরের সাজে সাজত।

বাজার সাজানো হত। অস্থায়ী বাজার বসত। যাতে লক্ষ লক্ষ মেহমানদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরবরাহ করা যায়। স্পেশাল ট্রেন ও বাস সমূহ আসত। প্রত্যেক ঘর তাদের সমর্থানুযায়ী নিজেদের ঘর মেহমানদের জন্য পরিষ্কার করত। আরামদায়ক বানানোর চেষ্টা করত, সাজাত। ঘরের উঠানে অতিরিক্ত আবাসস্থল তৈরির জন্য তাবু লাগানো হত। কেননা অধিকাংশ ঘর এত ছোট ছিল, মেহমান ও মেযবানদের আবাসন তাবু ছাড়া সম্ভব ছিল না। অনেক গৃহবাসী তাদের ঘরের সব কক্ষ মেহমানদের সোপর্দ করে দিত। আর নিজেরা বাহিরে উঠানে তাবুর মধ্যে চলে যেত।

মোট কথা ত্যাগের এক আশ্চর্য দৃশ্য দৃষ্টিগোচার হত যা রাবওয়াবাসীরা দেখত। মেহমানদের সেবা করে প্রত্যেকের মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠত। সুতরাং আমি যেভাবে বলেছি, এটা আমাদের লালিত স্বপ্ন, অলিক চিন্তা নয়, এটা আমাদেরকে নিরাশ করবে না বরং ঐ শান শওকত ইনশাআল্লাহ্ পুণরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, অবশ্যই হবে। আমাদের জন্য আবশ্যক, আমরা যেন খোদা তাআলার রহমত থেকে কখনও নিরাশ না হই। তার কাছে যেন যাচনা করে যেতে থাকি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আমরা এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখি যা আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে এক নবীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿۵۷﴾

"পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রভুর রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হয়?" (সূরা হিজর : ৫৭)

আমাদের এ নৈরাশ্য নেই যে, ঐ দিন ফিরে আসবে কিনা, বা কিভাবে ফিরে আসবে। আমি যেভাবে বলছি, ইনশাআল্লাহ্, ঐদিন ফিরে আসবে। কেননা আমাদের ঐ খোদার শক্তির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "যখন জোর জবরদস্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছায় আর কোথায় পরিত্রাণ দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন এটা তার চিরাচরিত নিয়ম তিনি অবশ্যই তার প্রিয় বান্দার খোঁজ নেন। (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৬৪)

সুতরাং আমরা যদি আন্তারিকতা দেখিয়ে তার নিকট সাহায্য যাচনা করতে থাকি তাহলে অবশ্যই তিনি সাহায্য করেন এবং করবেন। যখন সব উপায় নি:শেষ হয়ে যায় তখনও আল্লাহ্ তাআলা যিনি অতীব তওবা গ্রহণকারী তাঁর উপকরণ প্রতিষ্ঠিত থাকে। আল্লাহ্ তাআলা এক জায়গায় বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۲۹﴾

এবং তিনি হলেন সেই সত্তা যিনি নিরাশার পর বৃষ্টি বর্ষিত করেন এবং নিজের অনুকম্পা ছড়িয়ে দেন। তিনিই সব কাজ ও প্রশংসার মালিক (আশ শূরা : ২৯)। আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উভয় জীবনেই এটা খোদা তাআলার একটা সাধারণ নিয়ম। সাধারণভাবে খোদা তাআলা যখন নিরাশ লোকদের রহমতের দ্বারা সিক্ত করেন তখন যারা মু'মিন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿۲۷﴾

যারা ঈমান এনেছে, সত্যিকার মু'মিন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের বন্ধু। তাদেরকে তিনি নিরাশায় ছে ড় দেন না বরং এমন মু'মিন যারা তাঁর সামনে নত হয়, যারা চরম বিনয় প্রকাশ করে, অবশ্যই তিনি তাদের সংবাদ নেন। তাদের সাহায্যের জন্য অবশ্যই আসেন। নিজের রহমতকে তাদের জন্য প্রসারিত করে দেন। যার বর্ণনা আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে এভাবে এ শব্দাবলীতে করেছেন– (আশ্ শূরা : ২৭)

মু'মিন ও নেক কর্ম সম্পাদনকারীদের দোয়া কবুল করেন, আর নিজ ফযল দ্বারা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কৃত করার পদ্ধতি ও মানদন্ড মানবীয় চিন্তাভাবনারও অনেক উর্ধ্বে। তাই আমরা যখন এমন খোদার প্রতি ঈমান এনেছি তখন কোন কারণ নেই পুরাতন অবস্থা এবং স্মৃতি আমাদেরকে নিরাশ করতে পারে। হ্যাঁ যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, অনেক সময় মানুষ মনে করে, মুক্তির কোন আশা নেই। অর্থাৎ এমন অবস্থা যা মানুষের কর্তৃত্বাধীন হয় তখন **'লা তাকনুতু মির রাহমাতিল্লাহ্'**-এর ধ্বনি উচ্চারিত হয়। আর **'ওয়া ইয়ানশুরু রাহেমাতাহু'**-এর দৃশ্য এক দুর্বল মানুষ অবলোকন করে।

সুতরাং এটা আমাদের কর্তব্য আমরা যেন নিজের দিন ও রাত দোয়ার মধ্যে অতিবাহিত করি। বিশেষভাবে এই জলসার দিনগুলোতে যারা এ জলসায় এসে শরীক হয়েছেন। তারা কাদিয়ানে নিজেদের অবস্থানের প্রতিটি মূহূর্তে দোয়ায় ব্যায় করুন। বিশেষভাবে পাকিস্তান থেকে আগত আহমদীরা স্মরণ রাখুন, যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কেউ নিরাশ হয় না। সুতরাং নিরাশ হওয়া অন্যদের কাজ। আমরা তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত নই।

আমরা তো শেষ যুগের মাহ্দীর মান্যকারী।

আমাদেরকে তো আল্লাহ্ তাআলা এই মসীহ্ ও মাহ্দীর মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন। আমাদেরকে অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়ার পরিবর্তে সোজা সরল পথে চলা শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আহমদীরা সাধারণভাবে এ বিষয়টি জানে। এজন্যই তো দৃঢ় ঈমানের সাথে এ কষ্টও সহ্য করে, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তারা আহমদী বিরোধীদের প্রদত্ত কষ্টে কোন ভ্রুক্ষেপ করে না।

সে কারণেই তো নিজেদের শহীদদেরকে সম্মানজনকভাবে দাফন করার পর দোয়া করে নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করে। অত:পর নিজের অশ্রু শুধুমাত্র খোদার সমীপেই প্রবাহিত করে। তবে কদাচিত এক দুই জন হয়তো কোথাও কোথাও কিছুটা বিচলিতও হয়ে যায়। যার ধর্মের বেশ ভাল জ্ঞান রাখে আর জামা'তের কাজও করে তারা বলে আবার কেউ কেউ আমাকেও লিখে, কাঠিন্যের দিন দীর্ঘয়িত হচ্ছে। কাল বা পরশুর কথা হচ্ছিল, এ কাল বা পারশু শেষই হচ্ছে না। সর্বদা স্মরণ রাখবেন, জাতির জীবনে দিনের কোন গুরুত্বই নেই। জাতীর বয়সে কয়েক বছরের কোন গুরুত্ব থাকে না উন্নতিকারী জাতির দৃষ্টি শুধু একদিকে থাকে না, একটা দিকেই তারা দেখে না, তাদের দৃষ্টি জাতির সমষ্টিগত উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে পাকিস্তানের কঠিন অবস্থার পর, জামা'তি অগ্রগতি ও উন্নতির গতি কয়েকগুণ বেড়েছে। বরং আল্লাহ্ তাআলার ফযলে পাকিস্তানেও উন্নতি পূর্বের চেয়ে বেশি হচ্ছে, তবে হ্যাঁ অনেক কাঠিন্য রয়েছে, অনেক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, আর্থিক ও প্রাণের ক্ষতি রয়েছে। খলীফায়ে ওয়াক্তকে জামা'তের সাথে সরাসরি এবং জামা'তকে খলীফায়ে ওয়াক্তের সাথে সরাসরি সাক্ষাত না লাভের একটা মর্মবেদনা দুই দিক থেকেই রয়েছে। নি:সন্দেহে এটা তার নিজের জায়গায় ঠিক কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার অনুকম্পায় MTA -এ অর্ধেক সাক্ষাতের একটি রাস্তা আমাদের জন্য খুলে দিয়েছে। পাকিস্তানে যদিও ইজতেমাও জলসায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তবুও এমটিএ-এর মাধ্যমে অনেক জলসা ও ইজতেমাতে পাকিস্তানসহ বিশ্বের প্রত্যেক আহমদী শামিল হচ্ছেন। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা সত্বেও খোদা তাআলা আধ্যাত্মিক খাবারকে বন্ধ হতে দেন নি।

অতএব আল্লাহ্ তাআলার যখন এত অনুগ্রহ রয়েছে তখন কখনও কারো মনে নৈরাশ্য সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। বরং এই দিনগুলোতে রাবওয়াবাসী ও পাকিস্তানবাসীকে নিজেদের এই ব্যাকুলতাকে খোদা তাআলার সমীপে বিনীত দোয়ার রূপান্তরিত করা উচিত। আমি নিজের স্মৃতিতে রাবওয়ার জলসার জাঁকজমক ও পুত পবিত্র পরিবেশকে নিয়ে চিন্তা করি, খোদা তাআলার তকদীরকে যা আহমদীয়াতের বিজয়ের তকদীর, এটা নিয়ে চিন্তা করি, আর এটাই প্রত্যেক আহমদীর কাজ। ঐ তকদীর যা মহানবী (সা.)-কে, মহানবী (সা.)-এর ধর্মকে জগতে বিজয়ী করার তকদীর। যেটা মুহাম্মদী মসীহ্র জামা'তের সাথে জগতের অধিকাংশ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার তকদীর। যেটা অন্যান্য জাতির মত পাকিস্তানীদের উপরও মসীহ্ মাওউদের সত্যতাকে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত প্রকাশের তকদীর। সুতরাং আমাদেরকে নিজেদের দোয়ায় এক বিশেষ ধরন সৃষ্টি করে এই ঐশী তকদীরকে নিজের জীবদ্দশাতে দেখার জন্য আল্লাহ্ তাআলার সমীপে বিনয়কে শেষ মার্গে পৌঁছিয়ে যাচনা করে যাওয়া উচিত।

রাবওয়ার জাঁকজমক ও পুতপবিত্র পরিবেশ আমার স্মৃতিতে এভাবে জাগরুক সর্ব উচ্চ যে, রাবওয়ার সড়কগুলোতে জলসা গাহে যাওয়া আসার সময় ভীর লেগে যেত । কিন্তু তা সত্বেও এ ভীড়ে কোথাও পরস্পর ঠেলাঠেলি হবে এটা সম্ভব ছিল না। পুরুষ ও মহিলারা যাওয়া বা নিজেরাও সতর্ক থাকতো। আর কোথাও যদি বিন্দুমাত্র কোন (সমস্যা) হতো তাহলে আতফালরা ও খোদ্দামরা যারা ডিউটিতে থাকতো, যারা রস্তায় ডিউটিতে পথ নির্দেশনা দেয়ার জন্য দাঁড়ানো থাকতো, তারা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতো।

আর দৃষ্টি আকর্ষণের পর তাৎক্ষণিকভাবে সবাই নিজ নিজ রাস্তায় চলতো। আর লোকদের এক ক্রমাগত ধারা চলতে থাকতো। যেভাবে পানির একটি স্রোত বা একটি নদী প্রবাহিত হয়, এভাবে লোকেরা জলসা গাহের দিকে যেত আর জলসা শেষ হওয়ার পর এভাবে ফিরে আসতো। রাস্তার এক পাশে পুরুষরা আর অন্য পাশে মহিলারা চলতো। প্রত্যেক পুরুষের মহিলার পবিত্রতার খেয়াল থাকতো। প্রত্যেক মহিলার নিজের লজ্জার খেয়াল থাকতো। পুরুষ মহিলা একে অন্যের রাস্তা ক্রস করার প্রশ্নই উঠতো না এমন কি কোথায়ও হোচট লাগার অবস্থা হলেও না। পর্দার বাধ্যবাধকতা ও চক্ষু অবনত রাখার দৃশ্যাবলী সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হত।

এ দৃশ্য মানুষকে মদীনার গলিতে নিয়ে যেত। আঁ-হযরত (সা.) যখন বলেন, পুরুষ মহিলা পৃথক পৃথক রাস্তা অবলম্বন করুন। মহিলারা দেয়াল ঘেঁষে একপাশ হয়ে চলতে থাকুন। এত আনুগত্য হতো যে, বর্ণনায় এসেছে অনেক মহিলা এত বেশি দেয়ালের কিনার ঘেঁষে চলতো, অনেক সময় চাদর দেয়ালের পাথরের সাথে আটকে যেত। (সুনান আবু দাউদ কিতাবুন্ নাওম, বাব ফি মাশীয়ুন্ নিসায়ে মায়া' রিজালে ফিত্তারিক্বে, হাদীস নম্বর : ৫২৭২))

এগুলো সব এজন্য ছিল যে, তারা আনুগত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন আর নিজেদের লজ্জাশীলতা ও পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। আমি যা বলেছি, এ দৃশ্য আমরা রাবওয়াতেও জলসার সময় দেখতাম। ইসলামী রীতির দৃষ্টান্ত রাবওয়াতে আগতরা সাধারণ দিনে সাধারণত আর জলসার দিনগুলোতে বিশেষভাবে দেখতো।

কাদিয়ানের রাস্তা ও গলিগুলি ছোট। এ কারণে এখানে যারা জলসাতে প্রথম বারের মত শামিল হচ্ছেন, বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশ থেকে আসছেন তাদেরও বলছি, অনেক সময় এমন ডিউটিরত কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া খেয়াল থাকে না পুরুষ ও মহিলা নিজ নিজ পৃথক রাস্তায় চলবে। কাদিয়ানের ব্যাপারে তো অন্যরাই আজ থেকে আশি/নব্বই অথবা একশ বছর পূর্বে লিখেছে, সেখানে ইসলামী শিক্ষা বা ইসলামী মূল্যবোধ বা আসল ইসলামী দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়। তাই এই ট্রেড দৃষ্টান্ত আজও কাদিয়ানে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত, যদিও দূর-দূরান্ত থেকে অন্যরাও জলসায় এসে থাকবে।

সুতরাং লজ্জা ও আত্ম-সম্মানবোধের প্রকাশ ও সংরক্ষণের সাথে সাথে জলসায় যারা শামিল হচ্ছেন তারা নিজেদের নামাযও বিশেষভাবে সংরক্ষণ করুন। আযানের ধ্বনির সাথে সাথে প্রত্যেকের যাত্রা মসজিদের অভিমুখে হওয়া উচিত। এভাবে জলসার কর্মকান্ড চলার সময়ও জলসার প্রোগ্রাম শুনার পুরোপুরি চেষ্টা ও মনোযোগ থাকা আবশ্যক। যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, জলসা কোন মেলা নয়। বর্তমান সংবাদ অনুযায়ী সেখানে এখন পর্যন্ত ছয় সাত হাজার মেহমান বাহির থেকে চলে এসেছেন, ইনশাআল্লাহ্ আরও আসবেন। প্রত্যেকেই জলসার পবিত্রতাকেও দৃষ্টিগোচরে রাখুন। বরং পাকিস্তান থেকে আগত অনেক মানুষকে, আল্লাহ্ তাআলা সরাসরি জলসায় অংশগ্রহণ করে আধ্যাত্মিক উপকার লাভের সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং সেখানে প্রত্যেককে এক প্রকৃত মেহমানের মত কল্যাণ লাভের সর্বোচ্চ চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা আবশ্যক। নসিহত ও নির্দেশনার কথা শুরু হয়েছে তাই এদিকেও মনোযোগ আকৃষ্ট করে দেই যে, জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় ও কর্মে পুরোপুরি কুরবানীর স্পৃহা থাকা আবশ্যক। না আবাসনের জায়াগায় কোন অনিয়ম, না খাওয়ার সময় কোন অনিয়ম, না জলসাগাহে প্রবেশ এবং বের হতে অনিয়ম হবে। অনিয়ম হয় সাধারণত নিজ স্বার্থের কারণে, নিজের অধিকার সর্বাগ্রে নেয়ার চেষ্টা করার কারণে। সুতরাং ছোট খাট বিষয় থেকে নিয়ে বড় বড় বিষয়েও যদি কুরবানীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হয় তাহলে কখনও অনিয়ম হতে পারে না।

কখনও কখনও সুবিধাবাদী অথবা হিংসুক হিংসার কারণে চায় আর কখনও চেষ্টাও করে থাকে যে, কোন ভাবে কোন ব্যবস্থাপনায় যেন অনিয়ম সৃষ্টি কারা যায় যেন তার স্বার্থ সিদ্ধির সুযোগ হয়ে যায়। তাই সর্বদা স্মরণ রাখবেন, কোন আহমদীকে কখনও এমন কোন সুযোগ ঐ লোকদের অভিপ্রায় অনুযায়ী দেয়া উচিত নয় যাতে জামা'তের দুর্নাম হয় অথবা কোন ধরনের ক্ষতির আশংকা হয়। কাদিয়ানে হিন্দুরা, শিখরা আর খৃষ্টানরাও থাকে, প্রত্যেক আহমদীর আবশ্যক সে যেন প্রত্যেককে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

সাধারণভাবে সেখানকার অধিবাসীরা খুবই ভাল। কিন্তু কারো থেকে যদি কোন ভুল কথা হয়ে যায় তবুও নিজেদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। কাদিয়ানের অধিবাসীদেরও এ বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত। কখনও কোন মেহমানের আত্মভিমানের কারণে মেযবান বা ওখানকার অধিবাসীরা আবেগ তাড়িত হয়ে যান, অথবা কোন কথা শুনে আবেগ আপ্লুত হন। তাই কোন ধরনের এমন আবেগের প্রকাশ হওয়া উচিত নয়, যা থেকে কোন ধরনের ঝগড়া বা ফিৎনার ঝুকি জন্ম নিতে পারে। সেখানে বসবাসকারীরা পরস্পরের মাঝে সালামের প্রচলন করুন। চলতে ফিরতে একে অন্যকে চিনেন বা না চিনেন সালাম দিন। যেন ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালবাসার পরিবেশ সৃষ্টি হয় আর আরও বৃদ্ধি পায়।

যাই হোক, যেভাবে আমি বলেছি, জলসার দিন পাকিস্তানে বসবসকারী আহমদীদের জন্য বিশেষ দিন, তারা এদিন দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করুন। জলসায় পাকিস্তান থেকে যারা কাদিয়ানে এসেছেন তারা এবং অন্যান্য দেশ থেকে আগত লোকও, যারা ইন্ডিয়ান আছেন তারাও সবাই এ দিনগুলো বিশেষভাবে দোয়ায় অতিবাহিত করুন।

জলসায় অংশগ্রহণকারীরা তো বিশেষভাবে নিজেদের প্রতিটি মুহূর্ত দোয়ায় অতিবাহিত করবেন, আর করতে পারেন, কেননা তাদের জলসায় শামিল হওয়া তো আধ্যাত্মিক আশীষ লাভ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই আর না অন্য কোন কাজ আছে। আল্লাহ্ তাআলা এক সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, মসীহ্ মাওউদের জনপদে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশে এতো সংখ্যায় একত্রিত করে। আপনাদের আল্লাহ্ তাআলার সমীপে দোয়া করার সুযোগ হচ্ছে। তাঁর কাছে তাঁর আশীষ যাচনা করুন। তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করুন।

পাকিস্তান থেকে অংশগ্রহণকারীরা বিশেষভাবে পাকিস্তানে আহমদীদের অবস্থা ও দেশের অবস্থার জন্যও দোয়া করুন। এটা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ, **'উদউনী আসতাজিব লাকুম'** আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সারা দিব আমি তোমাদের দোয়া শুনবো। এটা আমাদেরকে আশ্বস্ত করে আর যখন পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখন এর চেয়ে ভাল কোন সুযোগ হবে কী যখন এক দুর্বল বান্দা আল্লাহ্ তাআলার নিকট চাইবে। আজ কাল তো সবচে বেশি জোরজবরদস্তির অবস্থা পাকিস্তানের আহমদীদের উপর করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি নির্যাতিতদের দোয়া শুনি। সুতরাং এই দিনগুলোতে নিজেদের নিপীড়িত হওয়াকে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে অশ্রু ঝড়ানোর মাধ্যমে বানান আর আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি থেকে অংশ লাভকারী হন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

অর্থাৎ অথবা আর তিনি কে যে অস্থির চিত্ত ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন, যখন সে তাঁকে ডাকে, আর তার কষ্ট দূর করেন। আর তোমাদেরকে ভূপৃষ্টের উত্তরাধিকারী বানান, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? তোমাদের মধ্যে অনেক কম লোক আছে যারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা নাম্‌ল : ৬৩)

এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "দোয়ায় কবুলিয়তের প্রভাব তখন সৃষ্টি হয় যখন সেটি অসীম বিগলিত অবস্থায় পৌঁছে। যখন বিগলিত অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এটার কবুলিয়তের প্রভাব ও উপকরণও সৃষ্টি হয়। প্রথমে উপকরণ আকাশে সৃষ্টি হয়, তারপর এটা ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এটা ছোট বিষয় নয় বরং এটা এক অত্যন্ত মাহন বাস্তবতা বরং সত্য হচ্ছে এটি, যে ঐশী ঝলক দেখতে চায় তারা উচিত সে যেন দোয়া করে।" (মলফুযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১৮)

সুতরাং নিজেদের দোয়ার প্রভাব ভূপৃষ্ঠে দেখানোর জন্য প্রথমে আকাশের অনুগুলোকে নড়াতে হবে। আপনারা কয়েক হাজার যারা নিজেদের বঞ্চিত অবস্থা দূর করার ও এক বিশেষ পরিবেশ থেকে কল্যাণ লাভ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা জলসাতে শামিল হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। নিজের এই বিগলিত অবস্থাকে সঠিক দিক প্রদর্শন

করে নিজের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপকরণ সৃষ্টির চেষ্টা করুন। যারা ডিউটি দিবে তারাও সেখানে চলে গেছেন। তারা শুধু এটা মনে করবেন না, তাদের উদ্দেশ্য শুধু ডিউটি দেয়া। নি:নিসন্দেহে এ খেদমত করুন কিন্তু চলতে, ফিরতে, উঠতে বসতে নিজের জিহ্বাগুলোকে যিকরে এলাহীতে সতেজ রাখুন। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে এর তৌফিক দিন।

যেভাবে আমি বলেছি এই সময় জলসাতে অংশগ্রহণকারী শুধুমত্র পাকিস্তানীদেরই ফরজ নয়, বরং সবাইকে এটা থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়া উচিত। পরিবেশও তৈরী হয়ে আছে তাই এ পরিবেশ থেকে পরিপূর্ণ লাভবান হোন। আর যেভাবে আমি বলেছি, বিশেষ করে পাকিস্তানীরা নিজেদের অবস্থার কারণে যা তাদের মাঝে বিগলিত অবস্থা রয়েছে, এটাকে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে উপস্থাপন করুন। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমি বিগলিত চিত্তের দোয়া শুনি। আর এমন বিগলিতরা শুধু নিজের জন্যই দোয়া করে না, বরং জামা'তের জন্যও দোয়া করছে।

আর জগতে রাসূল (সা.)-এর ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দোয়া করছে। এমন বিগলিতদের দোয়া তো আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই শুনেন। আর কেবল এটি নয় বরং দুনিয়ার প্রতি সহমর্মিতায় তারা ধর্ম বর্ণ ভেদাবেধ না করে সবাইকে ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্যও দোয়া করে। তাহলে এমন মানুষের দোয়া আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই শুনেন। যারা সৃষ্টির প্রতিও সহমর্মিতা প্রদশ্ন করে, মানবতার প্রতিও সহমর্মিতা রাখে আর ধর্মের প্রতিও সহমর্মিতা রাখে তাদের দোয়া আল্লাহ্ তাআলা শুনেন।

আবার আল্লাহ্ তাআলা শুধু এতটুকুই বলেন নি, আমি তোমাদের বিগলিত চিত্তের দোয়া কুবল করে তোমাদের কষ্টকে দূর করব। তোমাদের ব্যক্তিগত ও জামা'তী কষ্টকে দূর করে দেয়া হবে, তোমাদের কষ্টদাতাদের হাতকে রুখে দেব। আল্লাহ্ তাআলা কষ্ট দূর করার চিকৎসা পত্র শুধু মাত্র কষ্ট দূর করার মাধ্যমেই করবেন না বরং বলেছেন, **'ইয়াজআলুকুম খুলাফা আল আরদি'** অর্থাৎ তোমাদেরকে জগতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে। পূর্বে বানানো হয়েছে আর ভবিষ্যতও তার অমোঘ বিধান এমনই।

সুতরাং এটাই ঐশী অমোঘ বিধান, তাই নিরাশ হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। কেবল কষ্ট দূরই হবে না, বরং তোমাদের কষ্ট দূর করার পর তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী বানানো হবে। সুতরাং নিজের অসহায়ত্বের কান্না কাঁদবে না। এটা কাল পরশু কবে আসবে সেটির কথা না বল । যদি তোমাদের বিনয় ও বিগলিত দোয়া অভ্যাহত থাকে তবে তোমাদের এ কষ্ট দূর করতে কাল পরশু চলেই আসবে।

আর শুধু কষ্ট দূর করতেই আসবে না, বরং বিরোধীদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করতে আসবে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা। সুতরাং প্রকৃত উপাস্যের সমীপে অবনত হয়ে তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করুন। প্রত্যেক ধরনের নৈরাশ্য ও শিরক এটা গোপন শিরকই হোক না কেন এটা থেকে নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করুন। নিজের বংশধরদের রক্ষা করুন।

তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আমরা আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কারাদি থেকে কল্যাণ পেতে থাকবো। অতএব আমাদের খোদা কতই না প্রিয় যিনি বলেন, যদি তোমরা আমার একনিষ্ঠ ইবাদতকারী হও, তাহলে আমি তোমাদের যাচনাকৃত দোয়ায় তোমাদের যাচনার চেয়েও বেশি ফল দিব। এই ভুল ধারণায় থাকবেন না, জানি না আমাদের দোয়া আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছেও কিনা? আল্লাহ্ বলেন, তিনি তোমাদের অনেক নিকটে।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি তাতে তিনি এটাই বলেছেন।আমি এতোই নিকটে যে যখন এক বান্দা পরিশুদ্ধ হয়ে দোয়া করে আমি তার দোয়ার উত্তর দেই। তবে একটা শর্ত, তোমরা যে বিগলিত চিত্তে দোয়া করতে শুরু করেছ, এটাকে অব্যাহত রাখতে হবে আর আমার বিধানাবলীর উপর আমল করতে হবে। আমি যে কথাগুলো বলি, তাতে লাব্বায়েক বলতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "দোয়া এবং এর কবুলিয়তের মধ্যবর্তী সময়ে অনেক সময় পরীক্ষার পর পরীক্ষার আসে। আর এমন এমন পরীক্ষা আসে যে, কোমর ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত ও পবিত্র চিত্তের লোকেরা এ পরীক্ষা ও বিপদাবলীতে নিজের প্রভূ-প্রতিপালকের সহযোগিতার, সুঘ্রাণ পায়। আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে এরপরে সাহায্য আসে।"

এখন দেখুন তিনি বলেছেন–সুঘ্রাণ পায়। আমরা তো জামা'ত হিসেবে এই বিরোধিতা এবং কষ্টের শুধুমাত্র সুঘ্রাণই পাই নাই, বরং তার ফলও খাচ্ছি। নি:সন্দেহে আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিগত কুরবানী এবং শাহাদতের পর আফসোস করি, দুঃখে ভারাক্রান্তও হই, দুঃখও হয়, কষ্টও হয়। কিন্তু এ শাহাদত, ও কুরবানীগুলো আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়ে জামা'ত ফুলে ফলে সুসজ্জিত হচ্ছে।

তিনি বলেছেন, "পরীক্ষা আসার ফলে একটা লাভ এটাও হয়, দোয়ার জন্য আবেগ বৃদ্ধি পায়। কেননা যতই অত্যাচার নির্যাতন বাড়তে থাকে ততই আত্মার বিগলন সৃষ্টি হয়। আর এটা দোয়ার কবুলিয়তের লক্ষণ। সুতরাং কখনও ভয় পাওয়া উচিত নয়। অধৈর্য ও অসহিষ্ণু হয়ে নিজের আল্লাহ্ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা উচিত নয়। কখনও এটা ভাবা উচিত না, আমার দোয়া কবুল হবে না, অথবা হয় না। এমন ধারণা আল্লাহ্ তাআলার ঐ গুণাবলীকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে যে, তিনি দোয়া কবুলকারী।" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১৮)

অর্থাৎ যদি এটা মনে করেন, আমার দোয়া কবুল হবে না তাহলে আল্লাহ্ তাআলা দোয়া কবুল করেন এ গুণাবলীকে অস্বীকার করা হয়।

সুতরাং আজ পাকিস্তানের আহমদীদের চেয়ে বেশি এ কথাকে কে জানতে পারে, অথবা ভারতের কতক আহমদী যাদের উপর যুলুম নির্যাতন করা হচ্ছে, অথবা জগতের অন্যান্য দেশের আহমদী যারা কষ্ট এবং কাঠিন্যে চলেছে তাদের চেয়ে আর বেশি কে জানে, দুর্ভাবনা ও জবরদস্তি কি জিনিস? সুতরাং যখন নির্যাতন হয় তখন দোয়া কবুলিয়তের সময় নিকটে আসে।

আজ আমি এ আলোকে জলসায় অংশগ্রহণকারী সকলকে এবং পাকিস্তানী আহমদীদের বলছি, যাদের মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জনপদে জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ হচ্ছে আপনারা নিজেদের দুর্ভাবনা ও কাঠিন্যকে দোয়া এবং অশ্রুতে অতি সিক্ত করে তুলুন। আর এটাকে পূর্বের চেয়ে বেশি

নিজের জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে নিন যাতে এক প্রকৃত বিপ্লব সাধনকারী হতে পারেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি, তিনি বলেন, "জগতে এমন কোন নবী আসেন নি যিনি দোয়ার শিক্ষা দেননি। এ দোয়া এমন জিনিস যা বান্দা ও খোদার মাঝে এক বন্ধন সৃষ্টি করে।" এ রাস্তায় পা রাখাও কষ্টকর। কিন্তু যে পা রাখে তার ক্ষেত্রে দোয়া এমন এক মাধ্যম যা বিপদাবলীকে সহজ ও সরল করে দেয়। যখন বান্দা খোদা তাআলার নিকট অনবরত দোয়া যাচনা করে তখন সে অন্য মানুষে পরিণত হয়ে যায়।

তার আধ্যাত্মিক ময়লাসমূহ দূর হয়ে এক প্রকার প্রশান্তি ও আরাম লাভ হয়। আর প্রত্যেক ধরনের গোঁড়ামী ও লৌকিকতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি থেকে পৃথক হয়ে ঐ রাস্তায় যেসব বিপদাবলী আসে সেগুলো সব সহ্য করে নেয়। যে কাঠিন্যকে অন্যরা সহ্য করতে পারে না সে কেবল খোদার জন্য, খোদা তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করে নেয়। তখন খোদা তাআলা যিনি রহমান ও রহীম আর তাঁর আপাদমস্তক রহমত-তিনি সদয় দৃষ্টিপাত করেন এবং তার সমস্ত দুঃখ কষ্টকে আনন্দে বদলে দেন। (মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৯২)।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এমন দোয়া করার তৌফিকও দিন। আর আমাদের দোয়াসমূহকে কবুলিয়্যতের মর্যাদা দিন। আমাদের কষ্টকে দূর করুন। আর দ্রুত এটাকে আনন্দে পরিবর্তিত করে দিন। আমাদেরকে সর্বদা ঐ বান্দাদের মধ্যে গণ্য করুন যাদের উপর সর্বদা তাঁর ভালবাসার দৃষ্টি থাকে।

আজও একটি হৃদয় বিদারক সংবাদ রয়েছে। মর্দানে আমাদের এক যুবককে কাল শহীদ করে দেয়া হয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শহীদ মরহুম তার পিতা মোকাররম শেখ জাভেদ আহমদ সাহেব এবং নিজ চাচাতো ভাই শেখ ইয়াসির মাহমুদ সাহেব পিতা মোকাররম শেখ মাহমুদ সাহেব শহীদ এর সাথে দোকান থেকে সন্ধ্যা পৌনে সাতটার সময় ঘরে ফেরৎ আসছিলেন। মোটর সাইকেল আরোহী হামলাকারী পাশ্চাদধাবন করে ফায়ারিং করে। এতে মরহুম ঘটনা স্থলেই নিহত হন। শহীদ উমর জাবেদ সাহেব পিছনের সীটে বসা ছিলেন।

তার মাথা ও কোমরে গুলি লাগে। সামনের সীটে অবস্থানকারী শহীদ মরহুমের পিতা এবং শেখ জাভেদ আহমদ সাহেবের বাহুতে গুলি লাগে যাতে তারা আহত হন। ড্রাইভিং এর দায়িত্বে থাকা শেখ ইয়াসির মাহমুদ সাহেবের হাতে কাঁচের টুকরো লেগে আহত হন। দু'জন আহত যারা ছিলেন তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে তারা ভাল আছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ঝামেলা থেকেও রক্ষা করুন এবং শীঘ্রই পূর্ণ আরোগ্য দিন। যে চিহ্ন পাওয়া গেছে তাতে গাড়িতে প্রায় সতের আঠারটি গুলি লেগেছিল। যাই হউক এরপর অপরাধী পালিয়ে গেছে তথাপি সীমান্ত প্রদেশে এখন পর্যন্ত এ ভদ্রতা রয়েছে যে, প্রধান মন্ত্রীর পিতা মাহমুদ আযম খান হূতী সাহেব আহতদের দেখা শুনার জন্য এসেছেন। আবার হাসপাতালে স্টাফদের নির্দেশনাও দিয়েছেন, তাদের যেন সঠিক চিকিৎসা করা হয়।

আর শহীদের ঘরে সমবেদনা জানাতেও গিয়েছেন। এই বংশের নিয়াজ দীন সাহেব ১৯০৭ সালে বয়আত করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। শহীদের দাদা শেখ নাযির আহমদ সাহেব ১৯৩২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে বয়আত নেন।

তার সম্পর্কে পূর্বেও আমি বলেছি যে, শহীদের চাচা এবং শ্বশুর শেখ মাহমুদ সাহেবরা সাত ভাই ছিলেন। এ বংশে পূর্বেও শহীদ হয়েছেন। মর্দানের মসজিদে যে আত্মঘাতি হামলা হয়েছিল তাতে শহীদের চাচাতো ভাই শেখ আমের রেজা পিতা শেখ মুশতাক আহমদ সাহেব শহীদ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তার চাচা পিতা শেখ মাহমুদ আহমদ সাহেবকে ৮ নভেম্বর ২০১০ইং শত্রুরা শহীদ করে।

সে সময় ফায়ারিংয়ে তার ছেলে আহত হয়েছিল। ১৯৭৪ সালেও তার শ্বশুর বাড়ির এক ব্যক্তিকে শহীদ করা হয়েছিল। ১৯৭৪ সাল থেকে এ বংশে শাহাদাতের ধারা চলে আসছে। তারপরও তারা সমস্ত বিপদাবলী ও দুঃখকষ্টকে সহ্য করে যাচ্ছেন। আর পুরো বংশ খুবই বীরত্বের সাথে এটা মোকাবেলা করে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় বিগত শাহাদতে আমার তার সাথেও কথা হয়েছিল কেননা তাদের সবার সাথে আমার কথা হয়েছে, হয়তো তার সাথেও কথা হয়েছিল। সবাই খুবই সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার সাথে নিজেদের আবেগ প্রকাশ করেছেন।

মরহুমের চাচা ও শ্বশুর মোকাররম শেখ মাহমুদ আহমদ সাহেব, শহীদ ও তার সব ভাই বিভিন্ন সময় ২০ এর অধিক জামাতী কেইসে আসীরানে রাহে মওলা হয়েছেন। শহীদের দুই চাচাকে এক জামাতী মামলায় আদালত পাঁচ বছর কারাদন্ডের শাস্তি দিয়েছিল। যখন কিনা ঐ অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল তিন বছর, তবে পরে হাইকোর্ট তাদের মুক্তি দিয়েছিল। যেভাবে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই বংশে অপহরণও হয়েছে। তাদের দোকানে একবার বোমা বিস্ফোরণও ঘটানো হয়েছে। চাচার সাথেই তিনি ব্যবসায় শামিল ছিলেন। মর্দান-এর জেলা নাযেম খেদমতে খালক ছিলেন, মোহাসেব ছিলেন। সাধারণভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

আমি বলেছিলাম, সন্ধ্যায় হতেই নিজেদের ব্যবসা বন্ধ করে চলে আসবেন। যাই হোক ঐ দিন তিনি আসছিলেন। ঘরের প্রায় নিকটে পৌঁছে; প্রায় তিন চার শ গজ দূরে ছিলেন। তখন তাদের উপর ফায়ারিং করা হয় আর তিনি শহীদ হন। গত দুই বছর পূর্বে তার বিয়ে হয়েছে। তার স্ত্রী আছেন। তিনি সন্তান সম্ভবা।

আল্লাহ্ তাআলা তার স্বাস্থ্য ভাল রাখুন। আর প্রত্যেক ধরনের ঝঞ্ঝাট থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ তাআলা শহীদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর যাদের তিনি রেখে গেছেন তাদেরকে ধৈর্য, সহনশীলতা ও সাহস দান করুন। এখন নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ তার গায়েবে জানাযার নামায পড়া হবে।

অনুবাদ : **মওলানা বশিরুর রহমান**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।
সহযোগিতায়: মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলামি শিক্ষা

মওলানা বশিরুর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলাহ

(শেষ কিস্তি)

অকল্যাণ বর্জনের প্রথম চারিত্রিক গুণ হচ্ছে, এহসান অর্থাৎ চারিত্রিক পবিত্রতা বা সতীত্ব, ঐরূপ ব্যক্তি, যার মধ্যে কুদৃষ্টি বা কুকার্যের ক্ষমতা আছে অর্থাৎ প্রকৃতি যাকে ঐ ক্ষমতা দিয়েছে, যদ্বারা সে এই অপরাধে লিপ্ত হতে পারে, সে ঐ কুকর্ম হতে নিজেকে রক্ষা করে। যেহেতু উল্লিখিত অপবিত্র ক্রিয়া কলাপ এবং সূচনা পুরুষের ন্যায় স্ত্রী লোক দ্বারাও প্রকাশিত হতে পারে, এজন্য খোদা তাআলার পবিত্র গ্রন্থে স্ত্রী -পুরুষ উভয়ের জন্য এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছেঃ

(নূর-৩১-৩২) (নূর-৩৪) (হাদীদ-২৮)

অর্থাৎ "ঈমানদার পুরুষগণকে বল যে, তাদের চক্ষুদ্বয়কে না মাহরাম [যাদের সাথে বিবাহ বৈধ (অনুবাদক)] স্ত্রীলোকদেরকে দেখা থেকে যেন বাঁচিয়ে রাখে এবং ঐ সকল স্ত্রীলোকদেরকে খোলা চোখে না দেখে, যারা কামোদ্রেকের ক্ষেত্র হতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে অবনত দৃষ্টির অভ্যাস করবে এবং আপন লজ্জাস্থানকে যে করেই হউক বাঁচাবে। অনুরূপভাবে, না মাহরাম ও অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকদের গান, বাদ্য ও সুললিত কণ্ঠ শুনবে না। তাদের রূপ কাহিনী শুনবে না। এই নিয়ম দৃষ্টিকে পবিত্র রাখবার এবং চিত্তকে অবিকৃত রাখবার উত্তম পন্থা। তেমনি ঈমানদার স্ত্রীলোকদেরকে বল যে, তারাও যেন তাদের চক্ষু এবং তাদের কানকে না মাহরাম পুরুষ থেকে রক্ষা করে। অর্থাৎ তাদের কামোদ্দীপক স্বর শুনবেনা এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোকে আবৃত রাখবে এবং সৌন্দর্যময় অঙ্গ প্রত্রঙ্গ কোন না-মোহরাম ব্যক্তির নিকট অনাবৃত করবে না এবং ওড়না চাদর এমন ভাবে মাথায় দিবে যেন, কণ্ঠদেশ হতে মাথায় পৌঁছে। অর্থাৎ গ্রীবা, দুই কান, মাথা এবং কানপট্টি সব যেন চাদরের পর্দায় ঢাকা থাকে। নর্তকীদের ন্যায় মাটিতে পদযুগল দ্বারা আঘাত করবে না। এটা সেই পন্থা যা অবলম্বন করলে পদস্খলন হতে রক্ষাপ্রাপ্ত হবে" (২৪ঃ২১-৩২)।

বাঁচবার দ্বিতীয় উপায়-খোদামুখী হবে এবং তার নিকট প্রার্থনা করবে যেন তিনি হোঁচট খাওয়া থেকে এবং পদস্খলন থেকে রক্ষা করে। ব্যভিচারের কাছেও যাবে না (১৭ঃ৩৩)। অর্থাৎ এমন আচার অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকবে, যা মনে কু-ভাবের উদ্রেক করতে পারে। এমন সব পথ ধরবে না, যেখানে এই পাপ সংঘটনের আশংক্ষা থাকে। যে ব্যভিচার করে, সে পাপকে শেষ সীমানায় পৌঁছায়। ব্যভিচারের পথ অত্যন্ত মন্দ, এটা গন্তব্য পথকে রুদ্ধ করে এবং তোমাদের শেষ গন্তব্যস্থানের জন্য এ পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে বিবাহ করতে পারে না, তার কর্তব্য সে তার পবিত্রতাকে অন্য উপায়ে রক্ষা করবে (২৪ঃ৩৪)। যেমন, রোযা রাখবে, স্বল্পাহার করবে বা কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করবে।

কাম সংযম বা সতীত্ব রক্ষার পাঁচটি উপায়

এ আয়াতগুলিতে খোদা তাআলা চারিত্রিক পবিত্রতা লাভের জন্য শুধু উচ্চ শিক্ষাই দেন নি, বরং মানুষকে কাম বিষয়ের পবিত্র থাকার জন্য পাঁচটি প্রতিকারও বলে দিয়েছেন যথাঃ (১) না-মাহরাম নারীকে দর্শন হতে পুরুষের চক্ষুকে বাঁচানো। (২) না-মাহরাম পুরুষের কণ্ঠ শ্রবণ হতে নারীর কানকে বাঁচানো। (৩) না-মাহরাম স্ত্রীলোক ও পুরুষের সম্বন্ধে গল্প শ্রবণ না করা। (৪) আলোচিত কু-কর্মের সূচনাকারী যাবতীয় অনুষ্ঠান ও ক্ষেত্র হতে নিজেকে বাচিয়ে চলা। (৫) বিবাহ না হলে, রোযা রাখা ইত্যাদি।

এই সকল চেষ্টা-তদবীরের যাবতীয় পন্থা সম্বলিত মহান শিক্ষা, যা কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তা একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য। মানুষের স্বভাবজ অবস্থা যা কাম-প্রবৃত্তির উৎস, তা হতে মানুষ পরিপূর্ণ পরিবর্তন ছাড়া মুক্ত হতে পারে না। বরং মহাবিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। সেই কারণেই খোদা তাআলা আমাদেরকে পবিত্র মনোভাব লইয়া না-মাহরাম স্ত্রীলোকদের অবাধে দর্শন করা, তাদের শোভা ও সৌন্দর্য সব দেখা এবং তাদের নাচ, অঙ্গ-ভঙ্গি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করারও অনুমতি দেন নাই। বরং আমাদেরকে তাকিদ করা হয়েছে যে, আমরা যেন না-মাহরাম স্ত্রীলোককে এবং তার শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশক অঙ্গগুলিকে কখনও না দেখি, পবিত্র বা অপবিত্র কোন দৃষ্টিতেই নয়; তাদের সুকণ্ঠ, তাদের সৌন্দর্যের গল্প যেন আমরা না শুনি, পবিত্র ভাব দ্বারাও নয়; বরং আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন তা শোনা ও দেখাকে মৃত্যুর সমান ভয় ও ঘৃণা করি, যাতে আমাদের পদস্খলন না ঘটে। অবাধ দৃষ্টির ফলে যে কোন সময় পদস্খলন হতে পারে। সুতরাং যেহেতু খোদা তাআলা চান যে, আমাদের চক্ষু, হৃদয় এবং আমাদের মনোভাব সবই যেন পবিত্র থাকে, সেজন্য তিনি এ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিরোধকারী শিক্ষা দান করেছেন। এতে কোন সন্দেহ আছে কি যে, অবাধ মেলা-মেশায় পদস্খলন ঘটে? যদি আমরা কোন ক্ষুধার্ত কুকুরের সম্মুখে নরম-নরম রুটি রেখে আশা করি যে, কুকুরের প্রাণে এই রুটির কোন খেয়াল জন্মাবে না, তবে আমরা আমাদের এই ধারণা পোষণে ভুল করব। সুতরাং খোদা তাআলা চেয়েছেন, কু-প্রবৃত্তি যেন গোপন কার্যের সুযোগ না পায় এবং এমন কোনই লগ্ন বা ক্ষেত্র যেন উপস্থিত না হয়, যাতে কুৎসিত আশঙ্কা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

ইসলামী পর্দার এটাই দার্শনিক তত্ত্ব এবং এটাই শরীয়তের ব্যবস্থা। খোদার পবিত্র গ্রন্থে পর্দার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, স্ত্রীলোদেরকে কয়েদীর ন্যায় নজরবন্দী অবস্থায় রাখা। এইরূপ ধারণা সে সকল অজ্ঞ লোকেরা রাখে যারা ইসলামী ব্যবস্থার কোন খবর রাখে না। বরং পর্দার কাম সম্ভম বা সতীত্ব রক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্ত্রী পুরুষ উভয়ে পরস্পরকে অবাধ দর্শন ও পরস্পরের শোভা সৌন্দর্যের আকর্ষণ থেকে বিরত থাকা। কারণ এতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই মঙ্গল। পরিশেষে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, চোখ অবনত রেখে অসঙ্গত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হতে আত্মরক্ষা করার এবং সমগ্রভাবে দর্শন যোগ্য জিনিষ দেখার যে পন্থা, সেটিকে আরবী ভাষায় **'গাযযেবসর'** বলা হয়। প্রত্যেক সাধু ব্যক্তি, যিনি নিজের হৃদয় পবিত্র রাখতে চান, তাঁর পক্ষে মানবেতর জন্তুদের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা অবাধে চেয়ে দেখা উচিত নয়। বরং তার পক্ষে সামাজিক জীবনে **'গাযযেবসর'**- এর অভ্যাস অত্যাবশ্যক। এটা সেই শুভ এবং আশিসপূর্ণ অভ্যাস, যার ফলে তার এই স্বভাবজ অবস্থা এক মহান নৈতিক গুণরূপে রূপায়িত হবে, অথচ তার সামাজিক কাজকর্ম সম্পাদনে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। এই চরিত্র গুণকেই ইহসান ও ইফ্‌ফাত বা

কামবৃত্তির পবিত্রতা বলা হয়।

অমঙ্গল থেকে রক্ষার দ্বিতীয় প্রকার চারিত্রিক গুণ আমানত ও বিশ্বস্ততা নামে পরিচিত। অর্থাৎ অন্যের ধন সম্পদ অসৎ উপায়ে ও অসদুদ্দেশ্যে হস্তগত করে তাকে কষ্ট দেয়ায় অনীহা ও অসম্মতি। ঐ ব্যক্তিও এই চরিত্র গুণে গুণবান নহে, যে এই স্বভাবজ অবস্থাকে যথার্থ স্থানে প্রয়োগ বা ব্যবহার করে না। বিশ্বস্ত ও সৎ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। যে পর্যন্ত মানুষ এই গুণের সব দিক পালন না করে সে আমীন ও দিয়ানতদার (বিশ্বস্ত ও সাধু) হতে পারে না। এ সম্পর্কে নিম্নে উদ্ধৃত আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তাআলা আমানতের নীতি এইভাবে শিক্ষা দিয়েছেনঃ

(নিসাঃ ১০-১১ এবং ৬-৭)

"যদি তোমাদের মধ্যে এমন কোন ধনী ব্যক্তি থাকে, যার বুদ্ধি ঠিক নেই, যেমন এতীম বা নাবালক এবং আশঙ্কাও হয় যে, সে তার বুদ্ধিহীনতাবশতঃ তার ধন সম্পদ বিনষ্ট করবে, তবে তোমরা (কোর্ট অব ওয়ার্ডসরূপে) তার সমস্ত ধন সম্পত্তি অভিভাবক হিসেবে তোমাদের হস্তে গ্রহণ করবে এবং সেই ধন সম্পত্তি, যদ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য চলে এবং জীবিকা নির্বাহ হয়, সেই বুদ্ধিহীনদের হাতে সমর্পণ করবে না এবং সেই সম্পত্তি হতে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের খাওয়া পরার জন্য দিবে এবং তাদেরকে উত্তম কথা এবং কাজের কথা বলিবে। অর্থাৎ এমন কথা, যদ্বারা তাদের বুদ্ধি ও বিচার শক্তি বর্ধিত হয়, আর তারা অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করে এবং অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ না থেকে যায়। তারা বণিকের সন্তান হলে তাদেরকে বাণিজ্য পরিচালনার কৌশল শিখাবে। অন্য ব্যবসায় থাকিলে সেই ব্যবসায়ে তাদেরকে পাকা করবে। যা হউক, সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে শিক্ষা প্রদান করবে এবং সময়ে সময়ে পরীক্ষাও নিবে, তোমরা যা শিখিয়েছ তা আয়ত্ত করেছে কিনা। অতঃপর বিবাহের উপযোগী হলে, অর্থাৎ ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমে যখন দেখবে যে, তারা তাদের ধন-সম্পত্তি রক্ষার বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, তখন তাদের ধন সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করবে। তাদের ধন-সম্পদ অপব্যয় করবে না। বড় হলে তাদের ধন সম্পদ তারা ফিরিয়ে নিবে, এ ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র তাদের ধন-সম্পদের কোন ক্ষতি করবে না। অভিভাবকত্ব করার জন্য, ধনী ব্যক্তির পক্ষে তাদের অর্থ হতে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা উচিত হবে না। কিন্তু অভিভাবক যদি বিত্তহীন হয়, তবে ন্যায্য পরিমাণে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারিবে।"

আরবে অর্থ সংরক্ষকদের এই রীতি প্রসদ্ধি ছিল যে, এতীমের কার্যনির্বাহককে এতীমের ধন-সম্পদ হতে কিছু গ্রহণ করতে হলে, যথাসম্ভব এই নিয়ম পালন করত যে, এতীমের অর্থে বাণিজ্য দ্বারা যে লাভ হত, তা থেকে নিজেও নিত। কিন্তু মূলধন বিনষ্ট করত না। সুতরাং এখানে এই প্রথার প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে, 'তোমরাও এই প্রকার করবে।' অতঃপর বলেছেনঃ "এতীমের ধন-সম্পদ প্রত্যার্পণের সময় সাক্ষীর সম্মুখে প্রত্যার্পণ করবে (৪ঃ৬-৭)। দুর্বল ও অল্প বয়স্ক সন্তান থাকলে অন্তিম সময়ে এমন কোন ওসীয়্যত বা উইল করবে না, যদ্বারা তাদের স্বার্থহানি হয়। যারা এ প্রকারে এতীমের ধন সম্পদ ভোগ করে, যাতে তাদের প্রতি যুলুম করা হয়, তারা ধন সম্পদ ভোগ করে না বরং আগুন ভোগ করে। তারা পরিশেষে, দগ্ধকারী অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে' (৪ঃ১০-১১)।

এখন দেখ, খোদা তাআলা সততা ও বিশ্বস্ততার কত দিক শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং বর্ণিত সব দিক বিবেচনায় রাখলেই প্রকৃত সততা ও বিশ্বস্ততা বলবে। নতুবা যদি সঠিক বিচার ও বুদ্ধির সাথে বিশ্বস্ততার সব দিকে লক্ষ্য না রাখা হয়, তবে এ প্রকার সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে অনেক প্রকারের গুপ্ত অবিশ্বস্ততা, গোপন খেয়ানতও (আত্মসাৎ) লুক্কায়িত থাকবে। তারপর অত্যত্র বলেছেনঃ

(বাকারা:১৮৯, আনফাল:৫৯, শুআরা: ১৮২-১৮৪, নিসা:৩)

অর্থাৎ " তোমরা আপোষের মধ্যে একে অন্যের ধন-সম্পদ ভোগ করো না এবং তোমাদের ধন সম্পদ ঘুষরূপে কর্তৃপক্ষের নিকট এ উদ্দেশ্য নিয়ে উপস্থাপন করবে না যে, এ প্রকারে কর্তৃপক্ষের সাহায্যে অন্যের ধন সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারবে (২ঃ১৮৯)। গচ্ছিত ধন (আমানত) প্রকৃত হকদারকে প্রত্যর্পণ করবে (৪ঃ৫৯)। খোদা খেয়ানতকারী (গচ্ছিত ধনে হস্তক্ষেপকারী)-দেরকে পসন্দ করেন না (২৬ঃ১৮৪)। তোমরা মাপের সময় সম্পূর্ণ মাপবে এবং ওজনের সময় পুরা ওজন করবে। নির্দোষ দাঁড়ী পাল্লা দিয়ে ওজন করবে (১৭ঃ৩৬)। কোন প্রকারে কারোও অর্থের ক্ষতি করবে না। ফেৎনা ফাসাদের সংকল্প নিয়ে পৃথিবীতে চলাফেরা করবে না (২৬ঃ১৮৪)। চুরি, ডাকাতি, পকেট কাটা বা অন্য কোন অবৈধ উপায়ে অন্যের ধন-সম্পদ করায়ত্ত করার সংকল্প করবে না।" অতঃপর আরো বলেনঃ "তোমরা ভাল জিনিসের পরিবর্তে খারাপ বা নষ্ট জিনিষ দিবে না" (৪ঃ৩)। অর্থাৎ অন্যের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা যেমন অবৈধ, তেমনই মন্দ জিনিষ বিক্রয় করা বা ভালোর পরিবর্তে মন্দ দেয়াও অবৈধ।

এই আয়াতগুলিতে খোদা তাআলা অসততার যাবতীয় দিক বর্ণনা করেছেন এবং এরূপ পরিপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন, যার পর অসততার কোন দিক আলোচনার বাকী নাই। শুধু এই কথাই বলেন নাই যে, চুরি করো না, যার ফলে কোন নির্বোধ যেন মনে না করে যে, চুরি করা তার জন্য হারাম, কিন্তু অন্য সকল প্রকার অবৈধ উপায় হালাল। এ পূর্ণাঙ্গীন উপদেশ দ্বারা যাবতীয় অবৈধ উপায়কে নিষিদ্ধ নির্ধারণ করার মধ্যে সেই প্রজ্ঞাই নিহিত আছে। বস্তুতঃ যদি কেহ সূক্ষ্ম জ্ঞান ও দৃষ্টি দিয়ে সততা ও বিশ্বস্ততা সম্বলিত এই চারিত্রিকগুণ নিজের মধ্যে না পায় এবং এর সব দিক পালন না করে, তবে সে আমনত দিয়ানতের কোন কোন বিষয়ে সৎকর্ম করলেও , এটা তার নৈতিক গুণ ও সততা বলে গ্রাহ্য হবে না। বরং এটা বিচার বুদ্ধি ও জ্ঞান বিবর্জিত এক স্বাভাবিক অবস্থা হবে মাত্র।

অকল্যাণ পরিহার সংক্রান্ত নৈতিক গুণের তৃতীয় অবস্থাকে আরবীতে 'হুদ্‌না ও 'হাউন' বলে। অর্থাৎ অন্যের প্রতি যুলুম করে কাউকেও দৈহিক কষ্ট না দেয়া, নিরুপদ্রব মানুষ হওয়া এবং শান্তির সাথে জীবন যাপন করা।" এটা নৈতিক গুণের অন্তর্ভূক্ত তখনই হবে, যখন মানুষ আকাঙ্খা দ্বারা কাজ নিরুপদ্রব রূপে গড়ে তুলে শান্তিপ্রিয়তার নৈতিক গুণকে সঠিক পরিবেশে ব্যবহার করবে এবং অযৌক্তিক ব্যবহার বেচে চলবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এ শিক্ষা দেনঃ

(আনফাল:২, নিসাঃ ১২৯, আনফাল:৬২, ফুরকান: ৬৪, ফুরকান:৭৩, হামিম:৩৫)

অর্থাৎ পরস্পর সদ্ভাবের সাথে বসবাস করবে (৮ঃ২)। সদ্ভাবেই মঙ্গল নিহিত (৪ঃ১২৯)। অন্যেরা শান্তি স্থাপন করতে চাইলে, তোমরাও শান্তির জন্য অগ্রসর হবে (৮ঃ৬২)। খোদার পুণ্যবান বান্দাগণ শান্তির সাথে পৃথিবীতে চলেন (২৫ঃ৬৪)। যদি তারা কারও মুখে কোন বৃথা কথা শোনে, যা সংঘাতের সূচনা করে এবং বিবাদের ভূমিকা হয়, তা হলে তারা গাম্ভীর্যের সাথে সেটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় (২৫ঃ৭৩) এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিবাদ আরম্ভ করে না।" অর্থাৎ যে পর্যন্ত অধিক কষ্ট দেয়া না হয়, হাঙ্গামায় জড়ানোকে তারা ভালোবাসে না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের পরিচয় লাভের এটিই নীতি। ছোট খাট বিষয়কে কোন গুরুত্ব দিবে না, ক্ষমা করবে। এই আয়াতে

'লাগ্‌ব' শব্দ আছে। জানা আবশ্যক যে, আরবীতে 'লাগ্‌ব' বলতে সেইরূপ ক্রিয়াকলাপকে বলে, যেমন কোন ব্যক্তি কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুষ্টামি করে উস্কানিমূলক কথা বলে, যদ্বারা কোন প্রকৃত ক্ষতি হয় না। সুতরাং শান্তি প্রিয়তার লক্ষণ এই যে, এ প্রকার বৃথা কষ্টদানে ভ্রুক্ষেপ না করে গাম্ভীর্য অবলম্বন করা। কিন্তু কষ্ট দান যদি শুধু লাগব এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তার মাধ্যমে বাস্তবেই প্রাণ, ধন সম্পদ বা সম্মান আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে শান্তি প্রিয়তার নৈতিক গুণের সাথে এটার কোনও সম্পর্ক থাকবে না। অবশ্য, এই প্রকার অপরাধ ক্ষমা করলে এটাকে সেই নৈতিক গুণ বলা হবে যার নাম আফ্‌উ। (এই বিষয়ে ইনশা আল্লাহ্‌ পরে আলোচনা করা হবে) অতঃপর বলা হয়েছেঃ "দুষ্টামি করে কেউ বাজে কথা বললে তোমরা তাকে সৎভাবে শান্তিপূর্ণ জবাব দিবে। তখন এই আচরণে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হবে" (৪১ঃ৩৫)। বস্তুত: শান্তি ও সৎভাব বজায় রাখতে গিয়া অন্যায়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার সীমা শুধু ঐ পর্যন্তই হবে যার ফলে প্রকৃতই কোন অনিষ্ট হয় না এবং শত্রুর কেবল বৃথা বাক্যই ব্যয় হয়।

অকল্যাণ বর্জনের চতুর্থ প্রকার 'খুলক' হল নম্রতা ও সদালাপঃ

অকল্যাণ বর্জনের চতুর্থ প্রকার হচ্ছে, 'খুলক' হল "রিফ্‌ক্ব" নম্রতা ও "ক্বউলে হাসান" সদালাপ এই নৈতিক গুণ যে স্বভাবজ অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয় তাকে 'তালাকত' বলে অর্থাৎ প্রফুল্ল চিত্ততা। তালাকত বা প্রফুল্ল চিত্ততা একটা শক্তি এবং নম্রতা একটি নৈতিক গুণ, যা এই শক্তিকে যথাস্থানে ব্যবহারে সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে খোদা তাআলার শিক্ষা এইঃ

(বাকারা: ৮৪, হুজরাত:১২, হুজরাত:১৩, বানী ইস্রাঈল: ৩৭)

অর্থাৎ লোকের নিকট ঐ কথাই বলবে, যা প্রকৃতপক্ষে ভাল। (২ঃ৮৪) এক জাতি অন্য জাতিকে উপহাস বা নিন্দা করবে না। হতে পারে যাদেরকে উপহাস করা হয়, তারাই ভাল। কোন স্ত্রী লোক কোন স্ত্রীলোককে ঠাট্টা করবে না। হতে পারে যাকে ঠাট্টা করা হয়, সেই ভাল। কারও দুর্নাম করবে না। আপন জনের খারাপ নামকরণ করবে না (৪৯ঃ১২)। সন্দেহের বশে কিছু বলবে না। কখনও খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া দোষ জিজ্ঞাসা করবে না। একে অন্যের কুৎসা করবে না (৪৯ঃ১৩)। কারও বিরুদ্ধে সেই অপবাদ সৃষ্টি বা অভিযোগ আনয়ন করবে না, যার কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে নেই। স্মরণ রাখবে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে জবাবদিহি করতে হবে কান, চক্ষু, অন্তর প্রত্যেকের নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে" (১৭ঃ৩৭)।

দ্বিতীয় প্রকার নৈতিক চরিত্রের গুণাবলী হল কল্যাণ সাধন সম্পর্কিতঃ এ পর্যায়ের নৈতিক গুনাবলির মধ্যে প্রথম নৈতিক গুণ হল আফউ অর্থাৎ কারো অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া। এতে নিম্নবর্ণিত কল্যাণ সাধিত হয়। এক ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয় বা তার ক্ষতি সাধন করে বলে সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত। এই শাস্তি আইনের মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে। অপরাধীর জেল জরিমানা হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষমা দ্বারা সংশোধনযোগ্য বিবেচিত হলে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অপরাধীকে ক্ষমা করে দেয়, তা হলে উভয়েরই উপকার হবে। এক্ষেত্রে কুরআন শরীফের শিক্ষা হলঃ

(সূরা শুরা:৪১)

অর্থাৎ তারা সাধু, যারা ক্রোধ দমন করার স্থানে তাদের ক্রোধ দমন করে আর ক্ষমার উপযোগী ক্ষেত্রে অপরাধ ক্ষমা করে (৩ঃ১৩৫)। অন্যায়ের প্রতিফলের পরিমাণ ততটুকুই যতটুকু অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অপরাধ ক্ষমা করে এবং এমন পরিস্থিতিতে ক্ষমা করে যে, তাতে অপরাধীর ইসলাহ্‌ (সংশোধন) হয় এবং তাতে কোন অমঙ্গল সৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ ক্ষমা যদি সঠিক ক্ষেত্রে করা হয়, তা হলে ক্ষমাকারী এটার পুরস্কার পাবে' (৪২ঃ৪১)।

প্রকৃত নৈতিক গুণের সাথে সর্বদা ক্ষেত্র ও কালের সম্পর্ক থাকে। স্বভাবজ শক্তি অস্থানেও প্রকাশিত হয়। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে গাভী এবং ছাগ নিরীহ প্রাণী, কিন্তু একই কারণে এদেরকে নৈতিক গুণে ভূষিত বলে আখ্যায়িত করা যায় না। কেননা এগুলোকে ক্ষেত্র ও কাল বিচারের বুদ্ধি দেয়া হয় নাই। খোদার প্রজ্ঞা এবং খোদার সত্য ও পরিপূর্ণ গ্রন্থ প্রত্যেক নৈতিক গুণের ক্ষেত্রে স্থান কাল পাত্রের শর্ত আরোপ করে থাকে। কল্যাণ সাধন সম্পর্কিত **নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় হচ্ছে ন্যায়-পরায়ণতা, তৃতীয় কৃপা এবং চতুর্থ আত্মীয়তা সুলভ ঔদার্য,** "আল্লাহ তাআলার আদেশ, পুণ্যের বদলে পুণ্য কর এবং যদি আদল (ন্যায়পরায়ণতা) হতে বেড়ে এহসান (দয়া পরোপকারী) করার সুযোগ ও ক্ষেত্র পাও, তা হলে সেখানে এহসান কর এবং যদি এহসান থেকে বেড়ে আত্মীয়সুলভ স্বভাবজ আবেগে কল্যাণ করার ক্ষেত্র পাও, তা হলে সে স্থানে স্বভাবজ সহানুভূতিতে কল্যাণ কর। খোদা তাআলা তোমাদের স্থানকাল পাত্রের উপযোগিতার সীমা লংঘন করতে নিষেধ করেছেন। বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিবেক যেখানে সায় দেয় না, সেখানে এহসান করা, কিংবা যেখানে সায় দেয় সেখানে এহসান না করা , কিংবা যোগ্য ক্ষেত্রে আত্মীয়সুলভ করুণা প্রদর্শনে বিরত থাকা, মহান আল্লাহ্‌ নিষেধ করেছেন। আবার বাড়া-বাড়ি করে অযথা করুণা প্রদর্শনও নিষিদ্ধ করেছেন' (১৬ঃ৯১)। এই আয়াতে কল্যাণ বা কল্যাণ সাধনের ইসালে খায়রের তিনটি স্তরের কথা বলা হয়েছে।

প্রথম স্তর হল কল্যাণের বদলে কল্যাণ করা। এটা নিম্নস্তর এবং নিম্নস্তরের ভাল মানুষেও এই গুণ অর্জন করতে পারে। মানুষ তারই মঙ্গল করে, যে তার মঙ্গল করে থাকে।

দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। এটা এই যে, প্রথমেই নিজে পুণ্য করা এবং কারও প্রাপ্য ছাড়াই তার প্রতি এহসান দ্বারা উপকার করা। এটা মধ্যবর্তী স্তরের গুণ। অধিকাংশ লোক গরীবদের প্রতি এহসান (দয়া দাক্ষিণ্য ও পরোপকার) করে থাকে। এহসানের মধ্যে এক গুপ্ত ত্রুটি থাকে। এহসানকারী মনে করে যে, সে এহসান করেছে এবং সে কমপক্ষে তার এহসানের বদলে কৃতজ্ঞতা বা দোয়া কামনা করে। যদি এহসান প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তার বিরোধী হয়ে যায়, তখন সে তাকে অকৃতজ্ঞ আখ্যা দেয়। কখনও কখনও এহসানপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর ক্ষমতারিক্ত বোঝা চাপাইয়া দেয় এবং স্বীয় এহসান স্মরণ করায়। আল্লাহ্‌ তাআলা এহসানকারীদিগকে সতর্ক করে দিয়েছেনঃ

"হে এহসানকারীগণ! তোমাদের সদকাসমূহের ভিত্তি অকপটতার উপর হওয়া চাই। এহসান সমূহকে স্মরণ করিয়ে মনে দু:খ দিয়ে, সেটির পুণ্যকে ধ্বংস করো না (২ঃ২৬৫)।' সদকা শব্দটি সিদক (অকপট) হতে উদ্ভূত। সুতরাং যদি হৃদয়ে সিদক এবং এখলাস (নিষ্ঠা) না থাকে, তা হলে সেই সদকা আর সদকা থাকে না, বরং সেটা কপটতার কাজ হয়ে থাকে। অতএব এহসানকারীর মধ্যে এক ত্রুটি থাকে যে, সে কখনও ক্রোধান্বিত হয়ে স্বীয় এহসান স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই জন্য খোদা তাআলা এহসানকারীগণকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

কল্যাণ সাধনের তৃতীয় পর্যায় সম্বন্ধে খোদা তাআলা বলেন যে, এহসান করার কথা একটুও স্মরণ করবে না এবং কৃতজ্ঞতার প্রতি কোন দৃষ্টিপাত করবে না। বরং এমন এক সহানুভূতির প্রেরণা নিয়ে পরোপকার করবে,

যেমন অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের প্রতি করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, শুধু স্নেহের আবেগেই মাতা পুত্রের প্রতি কল্যাণময় আচরণ করেন। এ কল্যাণ সাধনের চূড়ান্ত পর্যায়, এটি ডিঙ্গিয়ে উন্নতি করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু খোদা তাআলা কল্যাণ সাধনের এই সব বিভাগকেই স্থান কাল পাত্রের সাথে সংবদ্ধ করেছেন। আলোচনাধীন আয়াতে তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে, এই সদাচারগুলি যথাস্থানে ব্যবহৃত না হলে, এই গুলি অনাচারে পরিণত হবে। ন্যায়পরায়ণতা অশ্লীলতায় রূপান্তরিত হবে। অর্থাৎ সীমার বাইরে গেলেই এটা অপবিত্র রূপ ধারণ করবে। তেমনি এহসান এর পরিবর্তে মুনকার এর রূপ প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি ও বিবেক সেটিকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং সেটির স্বরূপ এমন হয়ে যাবে যে, আত্মীয় সুলভমমতা বিদ্রোহে পরিণত হবে। অর্থাৎ পরিস্থিতির অনুপযোগী সাহানুভূতির আবেগ এক কুৎসিত অবস্থার সৃষ্টি করবে। প্রকৃতপক্ষে, বাগই শব্দ দ্বারা অতিবৃষ্টিকে বুঝায়, যা সীমার অধিক বর্ষণ করে এবং ক্ষেতসমূহকে ধ্বংস করে। আবার, ন্যায্য দাবীর খর্বতাকেও বাগই বলা হয় এবং ন্যায্য দাবীর বা অধিকারের আধিক্যও বাগই । বস্তুত: এই তিনটিই, সঠিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত না হলে কুচরিত্রে পরিণত হবে। এ জন্যই এ তিনটি গুণের সাথে স্থান কাল পাত্রের শর্ত লাগানো হয়েছে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, কেবল আদল, কেবল এহসান, কেবল আত্মীয় সুলভ ব্যবহার নৈতিক গুণে অভিহিত হতে পারে না বরং মানুষের মধ্যে এগুলি সবই স্বভাবজাত অবস্থা এবং প্রকৃতিগত শক্তি, যা শিশুর মধ্যেও জ্ঞান উন্মোষের পূর্বে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নৈতিক গুণ হওয়ার জন্য বুদ্ধি বিবেচনা ও বিবেক প্রয়োগের শর্ত বিদ্যমান। আরো শর্ত এই যে, প্রত্যেক সহজাত শক্তিকে সঠিক ক্ষেত্রে ও সঠিক সময়ে ব্যবহার করতে হবে।

এহসান সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন করীমে আরও জরুরী নির্দেশ বা হেদায়াত সমূহ রয়েছে। খোদা তাআলা সেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সেই শব্দগুলোর পূর্বে 'আল্' শব্দ ব্যবহার করে স্থান কাল পাত্রের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। (বাকারা-২৬৮, ২৬৫, ১৯৬, দাহার-৬-১০, বাকারা-১৭৮, ফুরকারন-৬৮, রা'দ-২২, যারিআদ-২০, আল ইমরান-১৩৫, রা'দ-২৩, তওবা-৬০, আল ইমরান-৯৩ এবং নিসা-৩৭-৩৮)।

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশে ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৬ষ্ঠ ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ০৪ জুন ২০১১ এর মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। ৪নং বকশী বাজার বরাবর পৌঁছতে হবে। আগামী ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ জুন ২০১১ তারিখ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্। আবেদনকারী ছাত্রদেরকে অবশ্যই ১৪ জুন ২০১১ তারিখ বিকাল ৫-০০টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা নিম্নরূপ হবে ঃ

১. এস. এস. সি/এইচ. এস. সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং গড়ে নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে।

২. এ বছর এইচ. এস. সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস. এস. সি -তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে।

৩. ভালো স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪. সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস. এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ. এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর।

৫. ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে।

৬. কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে।

৭. জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে।

৮. ভাল আহমদী তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে।

৯. আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে।

১০. বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হতে হবে।

১১. ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে।

১২. আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে–অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতা (চ) স্বহস্তে লিখিত আবেদন পত্র হতে হবে (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সুপারিশ থাকতে হবে (জ) জামাতি মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মাল এর সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামাতের এমন দুইজন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে থাকে তবে তা উল্লেখ করুন।

বি: দ্র: প্রত্যেক স্থানীয় জামাতে জুমুআর নামাযে একাধিক দিন সার্কুলারটি এলান এবং নোটিস বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার মোবাইল নাম্বার ০১১৯১৩৬৩৪১৮ অথবা ০১৯২২০২৪৫৯১।

সেক্রেটারী
বোর্ড অভ গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ বাংলাদেশ

এই ঈসা (আ.) খ্রিষ্টানদের নবী সেই ঈসা (আ.) নহেন

সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

জানুয়ারী ২০১১ সংখ্যা মাসিক মদীনায় প্রশ্নোত্তর কলামে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন, "ঈসা (আ.) কি আসবেন? প্রমাণ ভিত্তিক উত্তর চাই। ঈসা (আ.) যে আসবেন একথা কি পবিত্র কুরআনে আছে? উত্তর দাতা বলেছেন, "হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের প্রাক্কালে অবশ্যই আসবেন। তিনিই পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত ভয়ঙ্কর অপশক্তি দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

হযরত ঈসা (আ.) যে আসবেন এ সম্পর্কিত হাদীস শরীফে শতাধিক বর্ণনা রয়েছে। এই বর্ণনাগুলির মধ্যে আনুয়ার শাহ্ কাশ্মীরী অনন্য চল্লিশখানা হাদীসকে বিশুদ্ধতায় সর্বোচ্চ স্তরের বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ.) পুণরাবির্ভাব সম্পর্কিত কোন আয়াত আমার দৃষ্টিতে গোচর হয়নি। তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, কুরআনে যেহেতু নাই, তাই বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হতে পারে। কেননা সন্দেহ যুক্ত হাদীসের বর্ণনা কুরআনের বর্ণনার পাশাপাশি স্থান পাওয়ার যোগ্য"।

খাঁটি ঈমান ধর্মের একটি প্রধান ও প্রাথমিক ভিত্তি। ইহা ধারণ না করলে ধর্মের কোন ভিত্তি থাকে না। ঈমান অলীক বা অসত্য বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস নহে। ইহা স্বত: সিদ্ধ সত্য বিষয়ে বিশ্বাস। যদি কেউ বলে যে, গত রাত্রে হিমালয় পর্বত উড়ে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত হয়েছে, তা কখনো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। কেননা তা সত্য বিশ্বাস নহে। ঈমানদার মু'মিন মুসলমানগণ চির সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পর্বতের ন্যায় অচল অটল থাকে যা কখনো লোপ পায় না। ঝড় ঝঞ্ঝা আপদ বিপদ যতো কিছুই আসুক না কেন, বিশ্বাসে অটল থাকবে, কখনো পিছপা হয় না। অসত্যের উপর বিশ্বাস অলীক ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর, ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

প্রতিটি মু'মিন মুসলমানের পক্ষে দৃঢ় ঈমান রাখা অত্যাবশ্যক যে, হাদীস কখনো পবিত্র কুরআন করীমের সমকক্ষ হতে পারে না সে হাদীসের বর্ণনাকরী যত বড় আলেম ওলেমা মুফতী মাওলানা শাহ সূফী মতবাদধারীই হোন না কেন তা কখনো মর্যাদায় পবিত্র কুরআনের সমকক্ষ হতে পারে না। যে বিষয়টি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন করীমে কোন উল্লেখ নাই অথচ হাদীসের দোহাই দিয়ে প্রচলন করে বিশ্বাস করা এবং তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা ইসলামের দৃষ্টিতে বেদাত এবং নববিধান। হযরত রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন, "যে কেহ আমার শিক্ষার ভিতর এমন সব নব বিধান প্রবর্তন করে সে অভিশপ্ত।"

"যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা রটনা বা বর্ণনা করে জাহান্নামই তার স্থান।" পবিত্র কুরআনের আলোকে যা প্রমাণিত না হয়, যে বিষয়টি কুরআন করীম সমর্থন করে না তা অন্ধ ছেলেকে পদ্মলোচন আখ্যা দেয়ারই নামান্তর। পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ শিক্ষার পরিপূর্ণ কার্য বিপথগামী পথভ্রষ্টতা ও বেঈমানীর লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পবিত্র কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যারা ইহজগতে অন্ধ থাকবে তারা পরজগতেও অন্ধ থাকবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল) একথার মানে ইহা নয় যে, মাতৃগর্ভ থেকে যারা চক্ষুহীন অবস্থায় অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে পরজগতে তারাই অন্ধ থাকবে বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞান চক্ষু যাদের অন্ধ তারাই পরজগতে অন্ধ থাকবে। "বাহ্যিক চর্মচক্ষু অন্ধ নয়, পরন্তু হৃদয়চক্ষু অন্ধ, যা বক্ষে আছে। " (সূরা আলহাজ্জ) তারা বুঝবে না, এজন্য নিশ্চয়ই আমরা তাদের দিলের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছি এবং কর্ণ বধির করে দিয়েছি।" (সূরা কাহাফ)

অনেক এমন হাদীস রয়েছে যার ভাব ও ভাষা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান চক্ষুতে দেখে বিচার বিশ্লেষণ না করে বাহ্যিক চর্মচক্ষুতে দেখে বিচার বিশ্লেষণ করলেই তা একজন বিবেকবান বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে হয় সন্দেহযুক্ত, কুরআন করীমের বিরোধী বলে ধারনা জন্মে। যেমন হযরত ঈসা (আ.) অবশ্যই আসবেন এটা হাদীসের কথা কিন্তু কোন্ ঈসা (আ.), খ্রিষ্টানদের নবী ঈসা (আ.) না অন্য কেহ? খ্রিষ্টানদের নবী হযরত ঈসা (আ.) তো স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন ইহা পবিত্র কুরআনের কথা। যেমন বলা হয়েছে, "হযরত মুহাম্মদ রাসূল (সা.) ব্যতীত আর কিছুই নন। তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলগণ মৃত্যুবরণ করেছেন।" (সূরা আলে ইমরান) এমতাবস্থায় যদি কেহ বিশ্বাস পোষণ করে যে, খ্রিষ্টানদের নবী ঈসা (আ.) আসবেন তা হলে এটা পবিত্র কুরআন করীমের বিরোধী, মিথ্যা মনগড়া কাল্পনিক অসত্য অলীক ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। বাংলার বিখ্যাত আলেম মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব কুরআন করীমের সূরা আলে ইমরান তফসীর গ্রন্থে কুরআন হাদীস যুক্তি প্রমাণ ও দলীল দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করেছেন।

একজন ঈমানদার মু'মিন মুসলমানের পক্ষে অটল বিশ্বাস থাকা একান্ত আবশ্যক যে, যার জন্য আল্লাহ্ তাআলা আসমান জমীন এবং এতদ্যুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তৎসমূদয় সৃষ্টি করেছেন, সেই রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন জগতগুরু হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) যখন মরে গিয়ে মদীনার মাটিতে শুয়ে আছেন, এমতাবস্থায় আকাশে পাতালে বা অন্য কোথাও কেউ বেঁচে নেই এবং বেঁচে থাকতে পারে না।

যদি কারো বেঁচে থাকার প্রয়োজন হতো এবং

আল্লাহ্ তাআলা যদি কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইতেন তাহলে তাঁর পেয়ারা বান্দা বিশ্বনবী মানবকূল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) কে-ই বাঁচিয়ে রাখতেন এবং তিনিই বেঁচে থাকতেন। যারা খ্রিষ্টানদের নবী ঈসা (আ.)-এর আগমন অপেক্ষায় আসমানের দিকে তাকিয়ে আছেন, তারা অন্ধের হাতী দেখার ন্যায় হাতড়িয়ে মরছেন।মানবমুকুট হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মতগণ হুবহু ইহুদী খ্রিষ্টানদের পথ অনুসরণ করে চলবে।" (বুখারি ও মুসলিম) দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহায় আল্লাহ্ তাআলার দরবারে করুণা ভিক্ষা প্রার্থনা করা হয় যে, হে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সত্য সঠিক ও সরল পথে চালিত কর। অভিশপ্ত ইহুদী ও পথভ্রষ্ট খ্রিষ্টানদের পথে চালিত করো না। প্রশ্ন এই যে, ইহুদীগণ কি কারণে অভিশপ্ত হলো? এবং খ্রিষ্টান গণই বা পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রকৃত কারণ কি? হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন হয়েছিল ইহুদী জাতির মধ্যে ইহুদী জাতিকে উদ্ধার কল্পে। যে কারণে ইহুদীগণ হযরত ঈসা (আ.)-কে গ্রহণ করতে পারে না বরং ক্রুশে দিয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত করেছিল, তার প্রকৃত কারণ হলো ইহুদীগণের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্ববর্তী নবী ইলিয়াস (আ.) আসমানে আছেন। আসমান থেকে নেমে এসে তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা শক্তি বল প্রয়োগে জগৎ জয় করবেন। ইহুদী জাতির এ বিশ্বাস এখনো বর্তমান।

খ্রিষ্টান জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ হেতু বাবা আদম পাপী ছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে আদমসন্তানগণ সকলেই পাপী। ঈশ্বর একমাত্র তার জাত পুত্র যীশুকে [ঈসা (আ.)কে] পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। ঈশ্বর পুত্র যীশু (ঈসা আ.) ক্রুশে রক্ত দিয়ে আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে স্বর্গে নীত হয়ে ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন। যেরূপভাবে মেঘ রথে আরোহণপূর্বক স্বর্গে নীত হয়েছিলেন, সেইরূপভাবে মেঘ রথে আরোহণপূর্বক আবার তিনি পৃথিবীতে নেমে এসে জগত জয় করবেন।

মুসলমান জাতির নায়েবে রাসূলের দাবীদার আলেম ওলেমা মুফতী, মওলানা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরদের পরস্পর বিরোধী বিশ্বাস এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নাই। তিনি মরে গিয়ে মদীনার মাটিতে শুয়ে আছেন কিন্তু খ্রিষ্টানদের নবী হযরত ঈসা (আ.) মরেন নাই। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে স্বশরীরে আসমানে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন। আবার তিনি আসমান থেকে নেমে এসে খ্রিষ্টানজাতিকে নয় বরং বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত মুসলমান জাতিকে দাজ্জালের কবল থেকে উদ্ধার করবেন। বিশ্বাসের দিক দিয়ে ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমানজাতি একই পথের যাত্রী হয়ে হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র বাণী যে আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেহেতু ইহুদী, খ্রিষ্টান ও মুসলমান জাতি একই মত ও পথ বিশ্বাসী। সেই ইহুদী খৃষ্টান সদৃশ জাতিকে উদ্ধার কল্পে হযরত ঈসা সদৃশ নবীউল্লাহর আগমন হয়ে গেছে। এই ঈসা (আ.) খ্রিষ্টানদের নবী সেই ঈসা (আ.) নন। ঈসা (আ.)-এর গুণ ও বৈশিষ্ট-তুল্য মুহাম্মদী ঈসা নবী উল্লাহ। কোন নবীর দ্বিতীয়বার আগমনের অর্থ তাঁর গুণ বিশিষ্ট নবীর আগমন। আল্লাহ্ তাআলা সঠিক সময়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর স্বভাব গুণাবলী ও তুল্য মুহাম্মদী ঈসা (আ.) রূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। সূরা ফাতেহাতে এই প্রার্থনাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ইহুদীগণ যেমন হযরত ঈসা (আ.)-কে অগ্রাহ্য করে মুসলমানগণ যেন নব্য ইহুদীরূপে পরিণত হয়ে অভিশপ্ত না হয়।

হযরত ঈসা (আ.) আসমান থেকে নেমে এসে ঢাল তলোয়ার হস্তে দাজ্জালকে বধ করবেন। ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। পৃথিবীতে শান্তি সুখের স্বর্গভূমি গড়ে তোলাই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামের আদর্শ শিক্ষা প্রীতি, প্রেম, ভালোবাসা ও মহব্বতের পবিত্র বন্ধনে এক মানুষ আরেক মানুষকে মানুষের ভাই হিসেবে একতা শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, হত্যা, মারা-মারি, খুনা-খুনি দ্বারা অশান্তি সৃষ্টি করা ব্যতীত কখনো শান্তি কায়েম হতে পারে না। যেখানে অশান্তি সেখানে ইসলাম অনুপস্থিত।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি অন্ধ হওয়ার কারণেই পবিত্র কুরআন করীমের আলোকে ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টানগণই যে দাজ্জাল তা এ যুগের জ্ঞানান্ধরা চিনতে পারে নাই। ইসলামের প্রধান শত্রুই ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টান জাতি। ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে এমন কোন কলা কৌশল অবশিষ্ট রাখেনি যা প্রয়োগ করতে তারা বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি করেছে। কিন্তু নায়েব রাসূলের দাবীদার আলেম ওলেমা মুফতী, মাওলানা সাহেবগণ ঘুমের ঘোরে অচেতন অবস্থার কারণে দাজ্জালকে চিনে উঠতে পারে নাই, বরং দাজ্জালের দেখানো ও শেখানো পথই তারা অনুসরণ করে চলছে। তাই মহানবী হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "বহু টুপিধারী ব্যক্তি দাজ্জালকে অনুসরণ করে চলবে।" হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়ে গেছে।

"যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে দলিল প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হয়েছে এবং যেন সেই ব্যক্তিই জীবিত হয় যে দলিল প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করেছে।" (সূরা আনফাল) যুক্তি দলিল প্রমাণাদি দ্বীন ইসলামের মূল হাতিয়ার। ইসলামের সুমহান শান্তির বাণী প্রচারের মাধ্যমে যুক্তি প্রমাণ ও দলিলাদি দ্বারা ত্রিত্ববাদী দাজ্জালের মতবাদকে খন্ডন করে ইসলাম বা শান্তির সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসার দায়িত্ব ছিল ইসলামের নামধারী নায়েবে রাসূলের দাবীদারদের উপর।

ইহুদী খ্রিষ্টানগণের খপ্পরে পতিত হয়ে নায়েবে রাসূলের দাবীদারগণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের দরজায় তালা লাগিয়ে ঘুমের ঘোরে হলো অচেতন। এই অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যথাসময়ে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে মুহাম্মদী ঈসা (আ.) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে ইসলামের প্রচার ও প্রসারকল্পে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নামে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে নেতা বিহীন দল ও উপদলে শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলমান জাতিকে ঐক্যের ডাক দিলেন।

একমাত্র আহমদী জামা'তের প্রচারকগণই ইসলামের প্রচার ও প্রসারকল্পে আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে নিয়োজিত আছেন। তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের ফলে ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের বহু মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে সমবেত হয়েছে এবং হচ্ছে। আর দূরে না থেকে আপনিও নিজেকে এ ঐক্যের বাঁধনে বেঁধে নিন।

সম্পদের সন্ধানে

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

সম্পদ আহরণের তালাশে বা সম্পদ সংগ্রহ ও মজুদের নেশায় বিভোর নহে এমন স্বভাবের লোক এ দুনিয়ায় বড়ই বিরল। তবে আমাদের সমাজ চত্তরে কেউ কেউ এমনও আছেন যারা কিনা জাগতিক সম্পদকে খুব একটা বড় কিছু বলে মনে করেন না। যার ফলে তারা সেসব সম্পদ সন্ধানে কোনভাবে আসক্ত নহেন। পক্ষান্তরে এমন স্বভাবের লোক কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পদ আহরণের নিবিড় সন্ধানে থাকেন। খাকসারের আজকের এই উপস্থাপনা মূলত: তাদেরকে লক্ষ্য করেই।

উল্লেখ্য আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, "দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর যার আখেরাতে কোন ঘর নেই এবং ঐ ব্যক্তিরই মাল যার আখেরাতে কোন মাল নেই। আর দুনিয়ার জন্য সেই ব্যক্তিই সঞ্চয় করে যার কোন আকল বা বুদ্ধি নেই" (আহমদ, বায়হাকী, পুস্তক, কুরআন ও জীবন পৃ: ৩৯২)। এই প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ তাআলার সাবধানবাণী হচ্ছে, "তোমরা জেনে রাখ. এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাক-চিক্য, সৌন্দর্য তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা এবং ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র।

এর দৃষ্টান্ত বারিধারার ন্যায় যার দ্বারা (উৎপাদিত) শাক-সব্জী কৃষকদের চমৎকৃত করে, অত:পর তা পরিপক্ক হয় এবং তুমি তাকে হলুদবর্ণ দেখতে পাও, যা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। পরকালে রয়েছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন শাস্তি এবং (সৎকর্মশীল লোকদের জন্য) আল্লাহ্‌র তরফ হতে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি এবং এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) ছলনাময়ী ভোগ বিলাস ব্যতিরেকে আর কিছুই নয় (৫৭ : ২১)।

মূলত: এই উক্তি সমূহ এককভাবে জাগতিক সম্পদ ও এর আধিক্য লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। কেননা রাসূলে করীম (সা.) অন্যত্র বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যাকে দেখলেই আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়।" এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে সেই ব্যক্তি যাকে দেখলেই আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়? যাকে দেখলেই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় মাথা নুইয়ে আসে? তিনি সেই ব্যক্তি যার দেহাবয়ব ঐশী সম্পদের প্রাচুর্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। যার আত্মা পরা-সম্পদে পরিপূর্ণ। যিনি মর্ত্যে বাস করেও আকাশের নিয়ন্ত্রণে চলেন।

সুতরাং সততই মনে খায়েস জাগে সে সম্পদ কোথায়, কার কাছে এবং কিভাবে তা লাভ করা যায়? সেই স্বর্গীয় সম্পদের সন্ধান দিতেই আমার আজকের প্রয়াস। বিগত শতোর্ধ বছর অবধি আকাশ থেকে আগত হয়ে এক মহাজন কাদিয়ান দারুল আমানে বসে প্রত্যেককে আজলা ভরে ঐ সম্পদ দিবার তরে মমতা ভরা কণ্ঠে আহ্বান করছেন। আমি এ অধম এখন তাঁর হয়ে তাঁর তরে সেই আহ্বানকে সবার কর্ণ গোচরে আনার চেষ্টা করছি।

হে অনুসন্ধিৎসু জনেরা! যারা আত্মাকে সুস্থ রাখার খাতিরে চাহিত সম্পদ সন্ধানে বেকারার, যারা স্বীয় আত্মাকে আধ্যাত্ম সম্পদে সমৃদ্ধ করার মানসে সদা ক্রন্দনরত তাদের সমীপে আমার আরজ এই যে, খোদার মনোনীত ঐশী সম্পদ সমৃদ্ধ মাহ্‌দী (আ.) আপনাদের কাংখিত সেই সম্পদ দেয়ার তরে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আপনাদের কে কোথায় আছেন, আসুন– আপনারা সেই সম্পদের সন্ধান নিবেন কি? তাঁর (আ.) এ সম্পদ ভান্ডার পৃথিবীর সব দেশের সবার জন্য, সর্ব ধর্মের সকলের জন্য, পাপী-তাপী, উচ্চ-ম্লেচ্ছ, ধর্মপ্রাণ-ধর্মহারা সকলের জন্য উন্মুক্ত। অসাধারণ এ সম্পদের প্রাচুর্য্যতা এতটা-ই যে, যিনি আসবেন তিনিই সেই সম্পদে তার শূন্য ভান্ডকে পূর্ণ করে নিয়ে যেতে পারবেন। অত:পর পরিণত হতে পারবেন পরিপূর্ণ কামেল বান্দায়। আগে আসলে আগে পাবেন এর ভিত্তিতে নয় বরং যিনি যখনই আসবেন তখনই তিনি তার কাংখিত সম্পদের যতটুকু দরকার ততটুকু নিয়েই পরাৎপর জীবনে যেতে পারবেন।

এই কামেল ব্যক্তি তাঁর প্রিয় রাসূল যিনি জমিন ও আসমানের সব সম্পদের একচ্ছত্র মালিক তাঁর ফয়েজ লাভ করেই এ ধনভান্ডারের হকদার হয়েছেন। তাই বলছি, পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয়জন আর কেউ নেই যিনি কিনা ঘোষণার দ্বারা খোদার পক্ষের হয়ে অকাতরে সবাইকে সমহারে এ ধরনের সম্পদ সম্প্রদান করে আধ্যাত্মিকভাবে সম্পদশালী করতে পারেন।

দ্বিতীয় এমনজন আর কেউ নেই যিনি কিনা পাপে কলিঙ্কত আত্মা সমূহকে পুণ্যতায় পরিপূর্ণ করতে পারেন। তাঁর রচিত কিশতি-এ-নূহ্, বারাকাতুদ দোয়া, ইসলামী নীতি দর্শন, হাকীকাতুল ওহী, আল ওসীয়্যত, বারাহীনে আহমদীয়া এমনি ধরনের ৮৮ খানা কিতাবের প্রত্যেকটাই জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত অনুরূপ সম্পদে বোঝাই হয়ে আছে। হে অনুসন্ধানকারীগণ! আসুন, এ সম্পদ আহরণ করে নিজেকে ধন্য করুন।

এখন একথা বলা অতীব জরুরী যে, উক্ত সম্পদ তিনি (আ.) কেবলই তাঁর পুণ্যতার বদৌলতে অর্জন করেছেন এমনটি কিন্তু তাঁর দাবী নয়। বরং তাঁর দাবী হলো তিনি নবী আকরাম খায়রুল আম্বিয়া (সা.)-এর নগণ্য এক গোলাম ও বিশিষ্ট এক অনুসারী হওয়ার বদৌলতেই সেই মহান দয়ালু রাসূল এর খাজাঞ্চি হতে অনুদান হিসেবে এ সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, যা এতদিন ধর্মান্ধদের হীনস্বার্থ উদ্ধারের চাদরে আবৃত ছিল।

অজ্ঞদের অপব্যাখ্যার ফলে বিকৃতরূপ ধারণ করে খোদা প্রেমিকদের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে পড়ে রয়েছিল। বিধর্মীদের অপশক্তির থাবায় নিপীড়িত হয়ে কাতরাচ্ছিল অনাথ শিশুর মত। খোদার সেই প্রতিশ্রুত যুগ প্রতিনিধি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ধরায় আবির্ভূত হয়ে দোয়ার শক্তিবলে ঐশী ফেরেশতাদের দাঁড় করে ইসলামের উপর সবার নিক্ষেপিত অপবাদ অপব্যাখ্যা অপসারণ করত: পুণ: উন্মোচন করলেন মণি-মাণিক্যের পাহাড় আর কল্যাণে বোঝাই আধ্যাত্ম সম্পদের সেই চাকচিক্যের

স্বর্ণ স্তূপ।

তিনি (আ.) তাঁর লেখনি মেধায়, বক্তৃতার প্রাজ্ঞতায়, শত সহস্র পত্রাদি বিতরণ, বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে ঘরে ঘরে জনে জনে তাঁর এ সম্পদ নিবার তরে নিবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু সেই সাধু ও সজ্জনের বড়ই অভাব যারা এ সম্পদ সংগ্রহে সাগ্রহে এগিয়ে আসে। তবে একাজে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পবিত্র জামাতের অদম্য চেষ্টার কোন কমতি নেয়। বিগত শত বছর অবধি যেভাবে তারা মাহ্‌দী (আ.)-এর রেখে যাওয়া সম্পদ বিতরণ করছিলেন আজও তারা ঠিক সেভাবেই বরং সুদূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ঠিক একইভাবে সবার মাঝে বিতরণ করে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

আমি আমার স্বল্প জ্ঞানে ও মেধায়, স্বল্প চিন্তাশক্তি ও অভিজ্ঞানে কিভাবে বুঝাবো যে, এ সম্পদ বিনে মানুষের আত্মা মূল্যহীন। কিভাবে বুঝাবো যে এ সম্পদ কারজন্য কত দরকার? জাগতিক সম্পদ জ্ঞানে মানুষ বিজ্ঞানী হয়েছে, গুহার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে সে মানুষ চন্দ্রপৃষ্ঠে বিচরণ করতে সমর্থ হয়েছে, গ্রহ থেকে গ্রহে ভ্রমণের জ্ঞান লাভ করেছে, সে ভাল কথা বটে কিন্তু তা তাদের আত্মার মুক্তির কাজে কতটুকুই বা সহায় হবে? অনন্ত জীবনে অনন্য হওয়ার প্রয়োজনে তা কতটুকুই বা কাজে আসবে তা ভাববার অবকাশ থেকেই যায়।

হে প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আপনারা কি স্বীয় আত্মার মুক্তি কামনায় উদগ্রীব? আপনারা কি আপনাদের আত্মার জন্য সম্পদ সন্ধানে পিয়াসী? তা হলে আসুন আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার দেয় সম্পদের সন্ধান করুন। অবশ্যই এই সম্পদ নিজ শক্তি বলে আপনার আত্মাকে অন্ধকার থেকে তুলে এনে আলোয় পরিচালিত করবে। আপনাকে আধ্যাত্ম খাদ্য খাইয়ে পুণ্যতায় সমৃদ্ধ করবে এবং জীবনের উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণভাবে সফল করতে সাহায্য করবে। অত:পর আপনাকে পৌঁছে দিবে খোদার নৈকট্যে।

এখানে জেনে রাখা দরকার যে, এ সম্পদ প্রাপ্ত হতে গিয়ে জগত সংসার ত্যাগ করে বৈরাগী হতে হবে কিংবা নিজ প্রাণকে কষ্টের কঠিন চিবরে ফেলতে হবে এমন কিন্তু কিছু নয় বরং প্রয়োজন শুধু স্বীয় সত্তাকে তাক্‌ওয়াশীল করা, আপন হৃদয় ঘরে তৎপ্রতি বাসনা জাগ্রত করা, বুদ্ধিকে শুদ্ধি করে বিষয়টিকে বিচার বিশ্লেষণ করা, ইহজগতের সর্বগ্রাসী মোহ মায়ার জালে আবদ্ধ না হয়ে হৃদয়কে খোদার ভালবাসায় প্রলুব্ধ করা, বস্তুত: প্রয়োজন শুধু এতটুকুই।

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কতক নির্বোধ অবুঝের দল তাদের হাতের নাগালে ও চোখের সামনে স্বর্গীয় এই সম্পদ পেয়েও দেশ-বিদেশে দরগায় দরগায় আর পীরের মাজারে অর্থ অনুদান দিয়ে, বিভিন্ন মানসে মানত দান করে তাদের আত্মার নাজাত লাভের কামনায় চর্কির মত ঘুরছে। তারা আদৌ জানেনা যে, এসব কেবলা বাবা ও পীরপুরোহিতদের সাথে খোদার তিলার্ধ পরিমাণ সম্পর্কও নেই।

ধর্মে অন্ত:সার শূন্য এই বক ধার্মিকদের সথে খোদা কদাচ বাক্যালাপ করেন না। উপরন্তু তারা নিজেরাও বলে যে, খোদা আর এখন কারো সাথে বাক্যালাপ করেন না। ওহী ইলহামের দ্বার এখন চিররুদ্ধ। সঙ্গত কারণেই এসব নাদানগণ স্বর্গীয় সম্পদ প্রাপ্তির দিক থেকে একেবারেই নিঃস্ব। তাদের নিজেদের চোখেই ঐশী জ্যোতি নেই সুতরাং তারা অন্যকে কিভাবে পথ দেখাবে, নিজেদের উদরেই খাবার নেই সুতরাং তারা অন্যকে কিভাবে খাবার খাওয়াবে?

এই সম্পদ বিনে যে নিজেই পথের ফকীর সে অন্যকে কিভাবে এই সম্পদে সম্পদশালী করবে? তাদের কাছে ইপ্সীত এই সম্পদ আশা করা আর কোন বন্ধ্যা রমনীর বুকে দুগ্ধ পাওয়ার আশা করা একই কথা। কিন্তু খোদা কর্তৃক মনোনীত ইসলামের প্রাণরক্ষাকারী চিকিৎসক হযরত মসীহ্ ইবনে মর্তুজা (আ.) এমন ধরণের ভ্রান্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী নন।

তিনি (আ.) জীবন্ত খোদার উপর তেমন প্রত্যয় ও বিশ্বাস রাখেন যেমন কিনা জমিনের মানুষ আকাশে প্রদীপ্ত সূর্যের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস রাখে। তিনি (আ.) বিশ্বাস রাখেন যে, অযুত অর্বুদ বছর যাবৎ খোদা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সাথে যেরূপ সোহাগ-স্নেহের আচরণ করতেন, দয়া মায়া ও ভালবাসার বাক্যে শান্তনা দিতেন, আজও তিনি তাদের সাথে তাঁর সেরূপ আচরণ-বিধানই জারি রেখেছেন এবং অজানা ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তদ্রূপ জারী রাখবেন। মানুষ তাঁর দয়ার্দ্র খোদার আঁচল হতে অনুরূপ ঐশী সম্পদ পেতেই থাকবে।

এই চিরসত্য বিধান বলে আজও হযরত মসীহ্ মাওউদ কাদিয়ানী (আ.) সেই স্বর্গীয় সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। আর কাতর কান্নায় আহাজারী করে বলছেন, আমি বাজারে বন্দরে কোন জয় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলব যে, আমাদের খোদা এইরূপ, হায়! আমি মানুষের কানে সেই সম্পদের সংবাদ দিতে গিয়ে কোন কৌশল খাটাব যে ভেবে পাচ্ছি না। হে সত্যান্বেষীগণ! আপনারা আসুন, পক্ষপাতদুষ্ট ও বদধারণা বাদ দিয়ে সুশান্ত ও সুধারণায় বিচার বিশ্লেষণ করুন আমি আপনাদেরকে কি দিতে এসেছি এবং কার কাছ থেকে এনে কি দিচ্ছি।

তাই হে বন্ধুগণ! আমি সত্যসত্যই বলছি, কেবলমাত্র এই সম্পদই মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করতে পারে। মানুষের জীবনকে সর্বাবস্থায় হেফাজতে রাখার একমাত্র সহায়ক হলো এই সম্পদ। এতদ্বারা মানবাত্মা আধ্যাত্মিকভাবে আড়ম্বরতা লাভ করবে। অশুভ থাবায় ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। আত্মাকে নির্মল ও নিরঙ্কুশ নির্দোষ করে আলোকোজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত করবে।

জাগতিক যাবতীয় অপবিত্রতা হতে মুক্ত করে আকাশের ভালবাসায় প্রলুব্ধ করবে। এমতাবস্থায়, সে আত্মায় স্বর্গীয় শাসক এসে আসন গাড়বে। আত্মা তদ্রূপ অবস্থায় পরিণত হওয়ার পরই খোদা সেই আত্মাকে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা' বলে আখ্যায়িত করেন। অত:পর সেই আত্মাকে সম্বোধন কর খোদা বলেন, "হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এমতাবস্থায় যে, তুমি (তাঁর প্রতি) সন্তুষ্ট এবং তিনিও (তোমার প্রতি) সন্তুষ্ট। সুতরাং তুমি আমার বন্দাগণের মধ্যে প্রবেশ কর। এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জান্নাতে" (৮৯ : ২৮-৩১)।

মূলত: স্বীয় আত্মার পক্ষে এহেন আহ্বান পাওয়াই হচ্ছে মানব জনমের সার্থকতা, মানুষ হয়ে জন্মলাভের সফলতা। বন্ধুগণ! প্রকৃত কথা ইহাই যে, বর্তমান যুগই হচ্ছে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের যুগ। তিনি এসেছেনও বটে। কুরআন হাদীস, সময় পরিবেশগত অবস্থা সবই তাঁর দাবীর সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সুতরাং স্বর্গাগত মসীহ্ (আ.) যাঁর হাতে খোদা তাআলা এককভাবে ইসলামকে সংরক্ষণের দায়িত্বভার অর্পন করেছেন তাঁর প্রদেয় সম্পদ অর্জন ছাড়া দুনিয়ার কেউ আর এখন উল্লেখিত উদ্দেশ্য সফল করতে সমর্থ হবে না। সে নরাধম, ধিক তাকে যে কিনা সেই মসীহ্ (আ.)-এর আহ্বানকে উপেক্ষা করে কিংবা তাঁর স্বর্গীয় সম্মানকে উপেক্ষা করে অন্যপথে অন্যভাবে জীবনের উদ্দেশ্য সফলের চেষ্টা করে। বিশ্বাবাসীর উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"বর্তমানে পৃথিবীতে পথভ্রষ্টতার ঝড় উঠেছে, এ ঝড়ের সময় আমার খোদা আমাকে এক

কিশতি বানাতে বলেছেন, যার মধ্যে থাকছে জীবন রক্ষাকারী খাদ্য অর্থাৎ আত্মার খোরাক। যে ব্যক্তি আমার এ কিশ্‌তিতে আরোহণ করবে সে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পাবে আর যে অস্বীকার করবে সে অচিরেই অপমৃত্যু লাভ করবে। যে ব্যক্তি আমার হাতে হাত রাখবে, সে আমার হাতে নয় বরং খোদা তাআলার হাতে হাত রাখবে" (ফতেহ্ ইসলাম পৃ: ২৪)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমার হাতে এক প্রদীপ আছে, যে আমার নিকট আসবে সে অবশ্যই এ আলো থেকে অংশ পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারনা বশত দূরে সরে যাবে তাকে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলা হবে। এ যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু হতে প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই, যে পাপ বর্জন করে ও পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদা তাআলার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়। যে-ই এইরূপ করে সে আমার এবং আমি তার হবো। (ফতেহ ইসলাম পৃ: ৩২-৩৩)

হায়! দুর্ভাগ্য তাদের জন্য, দুঃখ লাগে তাদের জন্য, যাদেরকে এতভাবে বলার পরেও দুনিয়ার মোহ মায়ার বন্ধন পরিত্যাগ করতে রাজি নয়। এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাক্‌ওয়াপরায়ণ আত্মা ব্যতীত অন্য আর কারো পক্ষে এ সম্পদ অর্জন করা সম্ভব নয়। কেননা, এ সম্পদের মালিক দুনিয়ার কেউ নন, দুনিয়া কাউকে এই সম্পদ দেয়নি। এ সম্পদের একচ্ছত্র মালিক আকাশের অধিকর্তা সর্বশক্তিমান খোদা।

কাজেই যিনি দুনিয়াকে ছেড়ে আকাশের দিকে ধাবমান হবেন তিনিই এ সম্পদ লাভে সমর্থ হবেন। এমন কেউ আছেন কি, যিনি খোদা প্রদত্ত এ সম্পদ অর্জন করে সম্পদশালী হবেন আর ইসলামের তাজা বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিয়ে পৃথিবীকে স্বর্গ শান্তিতে পরিপূর্ণ করবেন?

শুভ বিবাহ

- গত ২৮-০২-২০১১ তারিখে মোছা: মরিয়ম সিদ্দিকা, পিতা-মৃত শের আলী মাষ্টার, আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ বোরহান উল হক, পিতা-মৃত: আনোয়ারুল হক দক্ষিণ সস্তাপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।

  বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৯২/১১

- গত ২৫-০৩-২০১১ তারিখে মোছা: হাদিয়া আফরীন (মিলি), পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান টি, এন, টি কোয়ার্টার ১০ই/বি বনানী ঢাকা-এর সাথে রাহাতুল হাসান (রফি), পিতা-ইব্রায়েতুল হাসান, ২, এন কৃষ্ণচুড়া, কল্যাণপুর, ঢাকা-এর বিবাহ ৩,০০০০১/- (তিন লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৯৩/১১

- গত ১৯/০১/২০১১ মোসা: মৌসুমী আক্তার, পিতা-কাজিমদ্দিন কাঞ্চন, রামের ডাঙ্গা, পঞ্চগড় এর সাথে মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান, পিতা-আব্দুর রশিদ, শালশিড়ি, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৬৫,১০১/- (পয়ষট্টি হাজার একশত এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৯৪/১১

- গত ১৮/০৩/২০১১ মোসা: পান্না বেগম, পিতা-মজিবর রহমান (চন্টু), আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর সাথে মীর সাক্কার আলী, পিতা-মরহুম মীর বিল্লাল, সরাইল, বি, বাড়িয়া-এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার টাকা) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮৯৫/১১

- গত ২৩/১১/২০১০ মোসা: মুর্শেদা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ ফালু মিয়া, শালশিড়ি, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ সোহেল রানা পিন্টু, পিতা-মরহুম সৈয়দ আলী মন্ডল, নিউসোনাতলা, সারিয়াকান্দী, বগুড়া-এর বিবাহ ৭২,০০০/- (বাহাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

  বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮৯৬/১১

- গত ০৪/০৩/২০১১ মোসা: শাহিনা কবীর তানীয়া, পিতা-হুমায়ুন কবীর, কান্দিপাড়া, বি. বাড়ীয়া-এর সাথে ওয়াসিম আহমদ পিয়েল, পিতা-মরহুম ডা: আব্দুল গফুর, তারুয়া, বি, বাড়ীয়া-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

  বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮৯৭/১১

- গত ১৮/০৩/২০১১ মোসা: বিপাশা খাতুন, পিতা-আব্দুল বারেক প্রামানিক, তেবাড়িয়া, নাটোর এর সাথে মোহাম্মদ আবু রায়হান, পিতা-জনাব আবু সাঈদ, মেরিগাছা, নাটোর-এর বিবাহ ১,৪৪,০০০/- (এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮৯৮/১১

- গত ২০/১২/২০১০ মোসা: হ্যাপি আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ জজ মিয়া, শালশিড়ি, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক পিতা-আবুহর শালশিড়ি, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৯৯/১১

- গত ০১/০৪/২০১১ মোসা: হালিমা বেগম, পিতা-মোহাম্মদ নূর শেখ, আহমদনগর, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আল আমিন, পিতা-মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, শালশিড়ি, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৬০,০০১/- (ষাট হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯০০/১১

- গত ২৫/০৩/২০১১ মোসা: লিমা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ গোলাপ আহমদ, উজানচর, বাজিতপুর কিশোরগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ জাহিদুল হক, পিতা-মোহাম্মদ ফজলুল হক, তারুয়া, আশুগঞ্জ-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

  বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯০১/১১

- গত ১৩/০২/২০১১ মোসা: মল্লিকা খাতুন, পিতা-মোহাম্মদ হারিস পাঠান, পাঠানপাড়া, শালশিড়ি, পঞ্চগড়-এর সাথে বিলাল মিয়া, পিতা-মোহাম্মদ মতি মিয়া, ফুলতলা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯০২/১১

- গত ২৭/০২/২০১১ মোসা: তাহমিনা পারভীন, পিতা-জনাব আবু তালেব গাজী, মিরগং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে আরাফাত গাজী, পিতা-সোহরাব গাজী, গোলখালী, চরামুখ, খুলনা-এর বিবাহ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

  বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯০৩/১১

- গত ০৪/০৫/২০১১ মোসা: মনিকা বেগম, পিতা-মরহুম আব্দুর রহিম মোল্লা, তারুয়া, আশুগঞ্জ, বি, বাড়ীয়া-এর সাথে মোহাম্মদ আশ্রাব মিয়া, পিতা-মোহাম্মদ আমান উল্লাহ্ মৃধা, কুকুয়া, বরগুনা-এর বিবাহ ১,২৫,০০০/- (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

  বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯০৪/১১

সন্ত্রাসবাদীদের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই

মাহমুদ আহমদ সুমন

সন্ত্রাসবাদী নেতা ওসামা বিন লাদেন পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে অবস্থিত পাকিস্তানের মিলিটারি একাডেমি থেকে মাত্র ৭শ' মিটার দূরে একটি বাড়িতে মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন গত ১লা মে, ২০১১, রোজ রবিবার। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে তো বটেই, সমগ্র বিশ্বে এক ধরনের স্বস্তি ফিরে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, তার মৃত্যুতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লাদেনের মৃত্যুতে বলেছেন, 'লাদেন মারা গেছে। কিন্তু মারা যাওয়ার আগে সে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের সন্ত্রাসী বানানোর অপচেষ্টা করেছে।' আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি লাদেনের সাথে প্রকৃত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম শান্তির ধর্ম। যেখানেই সন্ত্রাস, রক্তা-রক্তি, মারা-মারি সেখানে ইসলাম নেই।

ওসামা বিন লাদেন গড়ে তুলেছিলেন আল কায়দা নামের এক জঙ্গি সংগঠন। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন এবং তখন থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা করে সেগুলোর কিছু কিছু বাস্তবায়ন করেন। একই সময়ে তিনি আফগানিস্তানে এসে প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলে অসংখ্য তরুণ-যুবককে আল কায়দার আদর্শে দীক্ষা দেন।

তারই শিবির থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে জঙ্গিরা ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে ভয়াবহ হামলার পরিকল্পনাকারী হিসেবে তিনি অভিযুক্ত হন। তখন থেকেই তাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েক দফা হামলা চালানো হয় আফগানিস্তানে। দীর্ঘ দশ বছর তিনি নিজেকে অক্ষত রাখতে সমর্থ হন।

কিন্তু এবার শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। বিন লাদেনের নিহত হওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে আপাতত শেষ হল ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের দীর্ঘমেয়াদি এক যুগের। বিন লাদেনের রাজনীতি ছিল ধর্মীয় চরমপন্থার দোষে দুষ্ট। তিনি আধুনিক গণতন্ত্র ও মুক্তবুদ্ধির বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিলেন। শুধু আফগানিস্তান কিংবা মধ্যপ্রাচ্য নয়, ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি তার মতবাদ সমগ্র বিশ্বে। আল কায়দার নেটওয়ার্ক কাজও করে আসছে সে লক্ষ্যে। কিন্তু বাস্তবতা হল, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আল কায়দা ধরনের সহিংস আন্দোলনের বিপরীত দিকে অবস্থান করছে। বর্তমান যুগের মানুষ চায় মুক্তবুদ্ধির বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে, গণতান্ত্রিক সমাজে বিকশিত হতে।

সাম্প্রতিককালে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে একনায়ক-তন্ত্রের বিরুদ্ধে যে জোয়ার জেগেছে, এর মর্মকথাও একই। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতেও মানুষ রুখে দিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক মডেলের একনায়ক-তান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোগুলো।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এই, যে কোন বিধিবদ্ধ ছাঁচে বন্দি হতে চায় না সে। বিন লাদেন চেয়েছিলেন ধর্মীয় গোঁড়ামির ছাঁচে মানুষকে আটকে ফেলতে। এ লক্ষ্যে বল প্রয়োগের রাজনীতিকে আশ্রয় করেছিলেন তিনি। এই বল প্রয়োগ কতটা বীভৎস হতে পারে টুইন টাওয়ারের ধসে পড়া ছবি তারই নমুনা দেখিয়েছে আমাদের। ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে আচরিত একটি বিষয়। প্রতিটি ধর্মের মূল বাণী শান্তি। কিন্তু এই ধর্মই যখন প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে উঠতে চায়, রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, তখন তা আর শান্তির মাধ্যম থাকে না, হয়ে ওঠে সহিংস। বিন লাদেনের ধর্মপ্রীতির দিকে তাকালে কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিন লাদেন নিহত হওয়ার পর বিশ্ব থেকে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ উঠে যাবে কি? এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই। ধর্মীয় মতবাদের অন্তর্নিহিত একটি শক্তি রয়েছে, যা ধ্বংস করা সহজ নয়। ধর্মীয় চরমপন্থা এক ধরনের আবেগ, এক ধরনের রোমান্টিকতা। তরুণ ও যুবককে এই আবেগ, এই রোমান্টিকতায় সহজেই আপ্লুত করা সম্ভব। বাংলাদেশেও দেখা যায়, মাদ্রাসার তরুণ ছাত্রসমাজকে ধর্মীয় রোমান্টিকতায় আবিষ্ট করে ফায়দা লুটতে চাইছে মৌলবাদী গোষ্ঠী।

আমরা জানি, আমাদের দেশের মৌলবাদীরা রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করতো 'আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান'। এই

স্লোগান যারা এদেশে দিত তারাতো আজও বহাল রয়েছে। লাদেনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যখন কঠোর প্রদক্ষেপ নিচ্ছিল তখন এদশেও লাদেনের পক্ষে অনেক মিছিল-মিটিং করা হয়েছে। মিছিলে বলা হতো 'লাদেনের কিছু হলে জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে। সেই সময়ে আমি নরসিংদী ছিলাম। দেখতাম লাদেন ভক্তরা খুবই জোশ নিয়ে মিছিল করছে। এক ভক্ততো লাদেনের প্রেমে আসক্ত হয়ে তার ছেলের নামই রাখলেন লাদেন আর তার ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের নামও রাখলেন লাদেন ফোন সার্ভিস। গত দুই দশকের নিরবচ্ছিন্ন গণতন্ত্র চর্চার পরও তো আমরা দেখছি এদেশ থেকে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হচ্ছে না।

ওসামা বিন লাদেনের উত্থানে মার্কিনিরাই দায়ী। সোভিয়েত ইউনিয়নকে কাবু ও হয়রানি করার জন্য মার্কিনিরাই লাদেনকে জন্ম দিয়েছে। লাদেন যখন ইসরাঈলদের আগ্রাসন থেকে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তখনই মার্কিনিদের শত্রুতে পরিণত হন। একজন বিবেকবান মানুষ কোন অবস্থায় সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করতে পারেন না। লাদেনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও আমরা সমর্থন করি না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে মার্কিনিরা দেশে দেশে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করছে, এটাকে নিন্দা না জানিয়ে পারা যায় না। লাদেনকে আসলেই কি সেদিন হত্যা করা হয়েছে, নাকি অনেক দিন পূর্বেই হত্যা করা হয়েছে তা আসলে সঠিকভাবে বলা মুশকিল।

বাহ্যত দৃষ্টিতে মনে হবে, যেখানেই ধর্ম সেখানেই অশান্তি, যেখানেই ধর্ম সেখানেই নিগ্রহ ও নৈরাজ্য। কিন্তু না একটু মনোযোগ দিয়ে গভীর দৃষ্টিতে দেখুন। দেখতে পাবেন, সমগ্র বিশ্বের এই বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য প্রকৃত ধার্মিকদের পক্ষ থেকে নয় আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত সত্য ধর্মের অনুসারীদের পক্ষ থেকেও নয়। এসব নৈরাজ্য আসলে যারা সমাগত সত্য সুন্দর জ্যোতিকে অস্বীকার করে অন্ধকারের পূজারী হয়ে থাকতে চেয়েছে, যারা তাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও গলিত মথিত সমাজ দর্শন পরিত্যাগ করতে চায় নি–এসব অরাজকতা ও সন্ত্রাস সব সময় সর্বযুগে তাদের পক্ষ থেকেই পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

অনেকে মনে করেন হযরত রাসূল করীম (সা.) ইসলাম কায়েম করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে মহানবী (সা.) ও তাঁর অনুসারীরা দীর্ঘকাল মক্কায় অত্যাচারিত, নিপীড়িত থাকার পর যখন তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আবারও মক্কায় কাফেররা যুদ্ধ চাপিয়ে দিল কেবল তখনই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, একথা বলা হয়েছে, কেবল মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার্থে এই যুদ্ধ পরিচালিত হবে না। বরং মঠ, গীর্জা, সেনেগগ তথা সকল ধর্মের উপাসনালয় রক্ষার্থে আল্লাহ্ এ ব্যবস্থা নিয়েছেন। সকল ধর্মীয় ও বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেয়ে স্পষ্ট ঘোষণা আর কি হতে পারে!

কিন্তু আক্ষেপের ও লজ্জার বিষয় হলো, কুরআন করীমের অনুসারী হবার দাবীদার এক শ্রেণীর মুসলমান আজ কুরআন শরীফে বর্ণিত এই সম্প্রীতি ও সৌহার্দের শিক্ষা ভুলে গিয়ে, পরমত সহিষ্ণুতার পথ জলাঞ্জলি দিয়ে, যে কোনভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের নাম 'ইসলামী জেহাদ' রেখেছে। আত্মহত্যার মত হারাম কাজকে কাফের বধ করার 'জান্নাতি পন্থা' হিসেবে অবলম্বন করে বসে আছে। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাকে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল বৈধ নয় বরং আবশ্যক দায়িত্ব বলে ঘোষণা করে রেখেছে।

সবচেয়ে বেশী খারাপ লাগে তখন, যখন তাদের সমস্ত কলঙ্কিত চিন্তা-চেতনাকে তারা পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপ করতেও দ্বিধা করে না। আর তারা যা অপকর্ম করে তা ইসলামের নামে আর মানবতার শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নামে চলিয়ে দিচ্ছে যার ফলে তারা সারা বিশ্বে ইসলামের বদনাম বয়ে আনছে।

আজকাল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য সর্বত্র যে আন্দোলন করা হচ্ছে তা কখনও ইসলাম সমর্থিত নয়। পবিত্র কুরআন কখনই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করাকে নবী রাসূলদের আগমনের উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করে না বরং সমস্ত নবী রাসূলদের কথা উল্লেখ করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয় "সব নবী রাসূলের একমাত্র কাজ হলো ঐশী বার্তা পৌঁছে দেয়া।" সত্য গ্রহণ করা বা বর্জন করা মানুষের নিজস্ব স্বাধীনতা।

এর হিসাব সরকারকে বা রাষ্ট্রকে দিতে হবে না। মোল্লাকেও দিতে হবে না। দিতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌কে। আমরা চাই, সবাই তার নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে। আর এর নিশ্চয়তা সরকার প্রদান করবে। এছাড়া যারা ধর্মের নামে অধর্ম করে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ধর্মীয় উগ্রপন্থিদের সাথে যে দেশই সুসম্পর্ক বজায় রাখবে সে দেশে কখনো শান্তি ফিরে আসতে পারে না, পাকিস্তান এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। আর ইসলামে কখনো সন্ত্রাসবাদের স্থান ছিল না আর থাকবেও না। যারা ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত তারা কখনো শান্তির ধর্মের অনুসারী হতে পারে না। তাই আমরা বলতে পারি, বিন লাদেন ইসলামের নামে যা কিছু করেছে তা কখনও শান্তির ধর্ম ইসলামের শিক্ষা নয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় জীবন পরিচালিত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

কৃতি ছাত্রী

আমার মেঝো ছেলে জনাব এম.এ. হান্নান-এর বড় মেয়ে ছাবরিনা জাহান অন্বী ও আমার সেজো ছেলে জনাব মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম-এর বড় মেয়ে তানিয়া বিনতে মাহবুব তারা উভয়ই এ বছর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

আরো উল্লেখ্য যে তারা দু'জনই পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল। তাই তাদের ভবিষ্যত জীবনের সফলতার জন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা করছি।

দাদা রোস্তম আলী খলিফা
সাবেক প্রেসিডেন্ট, কুকুয়া জামা'ত

দৈনন্দিন জীবনে দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে সবাই তার কাছে যাচনা করে। প্রতিদিন তিনি নব নব মহিমায় প্রকাশিত হোন (আর রহমান : ৩০)। এই পৃথিবীর মানুষ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক জীবজন্তুই কোন না কোন ভাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে বা ডেকে থাকে। আর এই ডাকাই হলো প্রার্থনা বা দোয়া। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দোয়ার খুবই প্রয়োজন। আমরা অযথা কতই না সময় পার করছি কিন্তু কখনো কি চিন্তা করে দেখেছি? ঐ সময়গুলোতে যদি আমরা দোয়া করতাম তাহলে আমাদের জীবনের কতই না সমস্যা দূরীভূত হতো। সুধী পাঠক! আজ এই অধম আপনাদের সামনে দোয়ার বিষয়টি উপস্থাপন করবো যা হয়তো অনেকেরই মনের পরিবর্তন আনতে পারে এবং দোয়া করার ইচ্ছা মনে জাগতে পারে। এই লেখার মাধ্যমে কারো যদি সামান্য পরিবর্তন আসে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "এবং তোমাদের প্রতিপালক বলছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।" (আল-মোমেন ৬১)। আল্লাহ্ তাআলা যে মানুষের ডাকে সাড়া দেন তা বাস্তব সত্য কথা। আমরা নবী রাসূলগণের জীবন হতে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পেতে পারি।

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যখন কোন মুসলিম আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তার প্রার্থনা কবুল করেন অথবা তার কিছু খারাপী দূর করে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোন খারাপ জিনিসের প্রার্থনা করে যা তার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। একথা শুনে একজন বলল, 'তাহলে আমরা প্রচুর প্রার্থনা করবো। হযরত রাসূল করীম (সা.) বললেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের চেয়েও বেশি জবাব দানে তৎপর। (তিরমিযী)

বান্দা যতবারই দোয়া করুক না কেন আল্লাহ্ তার জবাব দিবেন বা দিয়ে থাকেন। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা প্রার্থনা শুনেন ও জবাব দেন তাই আমাদের উচিত প্রতি নিয়ত দোয়া বা প্রার্থনা করা এবং প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে বা পরে যে দোয়া রয়েছে তা পাঠ করা। হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, আমাদের প্রভূ জীবিত ও দানশীল। তিনি এমন ব্যক্তিকে খালি হাতে ফেরত পাঠাতে লজ্জাবোধ করেন, যে তাঁর কাছে দুহাত তুলে কিছু চায়। (বুখারী)

এ যুগের মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী তাঁর লিখিত পুস্তক 'ইসলামী নীতি দর্শনে' বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দোয়া নির্ধারণ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক আমি কবুল করব'। তিনি বার বার দোয়ার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, যাতে মানুষ আপন শক্তি দ্বারা নয়, বরং আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌র কুদরত দ্বারা লাভ করতে পারে। তিনি (আ.) আরও বলেন, "একমাত্র আল্লাহ্‌ই প্রার্থনা কবুল করতে পারেন এবং এটা বলা যায় যে, তিনিই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন। কেননা তিনি যা চান তা করেন এবং যা চান না, করেন না (সব কিছুই তাঁর ইচ্ছা ও সম্মতিতে সংঘটিত হয়)'। (মলফুযাত ৩য় খন্ড)

আমরা দৈনন্দিন যে কাজকর্ম করি তার প্রথমে দোয়া পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন নবী করীম (সা.) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেক কাজের আগে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পাঠ কর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা পরম দয়াময়। প্রত্যেক ভাল পুণ্য কাজের আগে এই দোয়া করা উচিত। অযাচিত অসীম দাতা পরম দয়াময়ের ইচ্ছায় বান্দার প্রত্যেকটি কাজে বরকত ও কল্যাণ লাভ হবে।

আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য চেয়ে যে কাজ করা হবে তাতে অবশ্য অবশ্যই কল্যাণ সাধিত হবে। তাই আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেক কর্মের পূর্বে তাসমিয়া পাঠ করার কথা। এটি বাচ্চাদের মাঝে প্রচলন করা। বাচ্চাদের বুঝানো উচিত যে, আল্লাহ্‌ই সকল কাজে সফলতা দান করেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "দোয়া হল ইবাদতের মগজ"। (কেননা তাতে চরম বিনয় রয়েছে,) (তিরমিযী)। যে ব্যক্তি দোয়া করে না তার মধ্যে বিনয়ী ভাব থাকে না। দোয়া মানুষের স্বভাবের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি করে থাকে। দোয়াকারী ব্যক্তি কখনো নিরাশ হয় না। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে। বিপদকালে মানুষের উচিত, একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ডাকা। অন্য কোন সত্তাকে প্রাধান্য না দেওয়া।

মানুষ যদি একটু চিন্তা করে আর এভাবে খোদার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস রেখে দোয়া করে তাহলে মহান খোদা তাআলা কখনই মানুষকে অভুক্ত রাখবেন না। তাই সকলের মাঝে এই অভ্যাস সৃষ্টি করা প্রয়োজন যে, প্রতিটি পদক্ষেপে খোদার প্রশংসায় মত্ত থাকা এবং খোদাকে সবকিছুতে সর্বশক্তিমান মনে করা।

আবার সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর আমরা যখন রাতে ঘুমাতে যাই তখনও দোয়া পাঠ করি। **"আল্লাহুমা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া"** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার নামে মারা যাই ও জীবিত হই। এখানে ঘুমকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানুষ যখন ঘুমায় তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। দুনিয়াবী কোন চেতনা থাকে না। এই ঘুম থেকে যদি সে আর না জাগে তাহলে এটাই তার জন্য মৃত্যু। অতএব ঘুম থেকে জাগা মানুষের কোন শক্তি নেই বরং এটা সেই মহান আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ ফজল ও কল্যাণ। কাজেই দোয়া এমনি বিষয় যা মানুষের চিন্তা চেতনাকে বৃদ্ধি করে। খোদা তাআলার প্রতি আকুল ভালবাসা সৃষ্টি করে। খোদার প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দোয়া থেকে বিরত থাকার কোনই সুযোগ নেই। সারারাত ঘুমানোর পর যখন মানুষ জাগ্রত হয় তখন খোদার প্রশংসায় পুন:রায় দোয়া করে "আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলায়হিন্নুশুর" অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের মৃত্যুর পরে জীবিত করেছেন আর তার দিকেই পুনরুত্থান হবে। এখানেও সেই খোদার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। আর এই মৃত্যু চিরস্থায়ী মৃত্যু নয়। কিন্তু যখন চির বিদায় হবে তখন আর কারও বেঁচে থাকার ক্ষমতা থাকবে না। সেইজন্য যতদিন আমরা এ নশ্বর দুনিয়াতে বেঁচে থাকবো আমাদেরকে খোদার সাহায্যেই বেঁচে থাকতে হবে শুধু বেঁচে থাকলেই চলবে না বরং আমাদেরকে খোদার হক ও বান্দার হক আদায় করতে হবে। হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "মাল্লাইয়ারহাম ওয়ালা ইউরহাম'

অর্থাৎ যে করুণা করে না তার প্রতি করুণা করা হবে না। প্রত্যেক মানুষকেই ব্যক্তিগত ভাবে ঈমানের ও আমলের জন্য দয়া করা হবে। কেননা, কিয়ামতের দিন কেউই কারও বোঝা বহন করবে না। প্রত্যেকের নিজের বোঝা নিজেকেই বহন করতে হবে।

মহান আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করার জন্য আমাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো, "অত:পর যখন তোমরা নামায শেষ কর তখন দাঁড়িয়ে এবং বসে এবং নিজেরদে পার্শ্বে শুয়ে তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর" (সূরা নিসা আয়াত ১০৪)।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোয়া করার জন্য কোন স্থান, কাল এর প্রয়োজন নেই। সুযোগ পেলেই সর্বদাই দোয়াতে রত থাকা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন। দেখ, তোমাদেরকে এই বলে আমি তবলীগের কর্তব্য পালনের দায়িত্ব মুক্ত হচ্ছি যে, পাপ বিষ বিশেষ তা পান করবে না। আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্যতা এক অপমৃত্যু বিশেষ তা হতে দূরে থাক। দোয়া করতে থাক যেন তোমরা মুক্তি লাভ করতে পার। যে ব্যক্তি দোয়া করবার সময় খোদাকে তাঁর প্রতিশ্রুতির বহির্ভূত বিষয় সমূহ ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মনে করে না, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সাথে খোদাকে স্মরণ করে না, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়। (কিশতিয়ে নূহ পৃ: ৩০-৩১) সকাল বা সন্ধ্যায় যখন আমরা পায়খানায় যাই সেখানেও দোয়া পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। পায়খানায় যাবার সময় আমরা এই দোয়া পাঠ করি **"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল খুবুছে ওয়াল খাবায়েছ"** অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার আশ্রয় যাচনা করছি সব ধরনের শারিরীক এবং আধ্যাত্মিক অপবিত্রতা থেকে। প্রাকৃতিক কষ্ট দূরীভূত হওয়ার পর যখন আমরা পায়খানা হতে বের হয়ে আসি তখনও আমরা দোয়া পড়ে থাকি। যেমন "বিসমিল্লাহে গুফরানাকা" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে! হে আমার আল্লাহ্ তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এছাড়া এই দোয়াও পড়ি "আলহামদুলিল্লা হীল্লাযী আযহাবান আন্নিল আযা ওয়া আফানি" অর্থাৎ সব প্রশংসা তাঁরই যিনি আমার কষ্ট দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করেছেন। আমরা যদি প্রত্যেক ছোট ছোট কাজের সময় নির্দিষ্ট দোয়া সমূহ পাঠ করি এবং আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য কামনা করি তাহলে অবশ্যই মহান খোদা তাআলা আমাদের যাবতীয় সমস্যাদি মিটিয়ে দিবেন। আমাদের উচিত উক্ত বিষয়গুলো আমলে আনা। নিজেদের মাঝে এই অভ্যাস সৃষ্টি করা যে প্রতি মুহূর্তে দোয়াতে রত থাকা। দোয়া একটি অপরিহার্য বিষয়। দোয়া ও প্রার্থনার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য কামনা করা উচিত। শুধু দোয়া পড়লেই হবে না আমি যা পড়ছি তার অর্থ জানা প্রয়োজন। এতে আবেগ সৃষ্টি হবে, প্রেরণা বৃদ্ধি পাবে।

আমরা যখন কোথাও দাওয়াত খেতে যাই তখন খাবার পর এই দোয়া পাঠ করি "আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফিহা মা রাযাকতাহুম ওয়াগফিরলাহুম ওয়ার হামহুম" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাদেরকে তুমি যে রিযক দান করেছ তাতে বরকত দান কর। এটি মেজবানের প্রতি বড় একটি কৃতজ্ঞতা যে, আমাকে কষ্ট করে দাওয়াত খাইয়েছেন যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তার জন্য এই প্রার্থনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আমরা যখন নতুন কাপড় পরিধান করি তখনও দোয়া পাঠ করি **"আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কামা কাছাও তানিহী আসআলুকা খায়রাহু ওয়া খায়রা মা সুনিয়ালাহু ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা সুনিয়ালাহু"** অর্থাৎ হে আল্লাহ্! সব প্রশংসা তোমারই যেভাবে তুমি এটি পরিধান করিয়েছো। আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এর মঙ্গলের নিমিত্তে এবং তার জন্যও যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে এবং আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে, এটির অমঙ্গল হতে যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে।

আমরা যে পোষাকই পরিধান করি না কেন এটাতে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত রয়েছে। কেননা একটি পোষাক তৈরীর পিছনে কত রকমের উপকরণ রয়েছে যা কল্পনা করে শেষ করা যাবে না। এছাড়া এর পিছনে কত মানুষেরও শ্রম রয়েছে। আর সে জন্য নতুন কাপড় পড়ার সময় দোয়ার দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

আবার আমরা যখন কোন অসুস্থ রোগীর সংবাদ শুনি তখন এই দোয়া পড়ে থাকি **"আযহিবিল বাসা রব্বা হাসি ওয়াশফি আন্‌তাশসাফি লা শিফায়া ইল্লাশিফাউকা শিফাআন নাইউগাদিরু সাকামো"** অর্থ হে মানুষের রাব্ব! এ রোগকে দুর করে দাও এবং আরোগ্য দান কর। তুমিই তো আরোগ্যদাতা। তোমার কাছে ছাড়া কোন আরোগ্য নেই। সে রকম আরোগ্য দান করো যেন অনুপরিমাণ রোগও না থাকে। এই দোয়াতো আমরা পড়বোই কিন্তু শুধু রোগীর জন্য দোয়া পড়াই যথেষ্ট নয়, রোগীর সেবা করা, রোগীর খোঁজ খবর নেওয়া এবং সামর্থ্য থাকলে সহযোগিতা করা এগুলো ঈমানের অংশ। আমরা জানি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন দেখলেন পথে কাঁটা নেই তখন তিনি মহিলার খবর নিলেন এবং তার বাড়িতে গেলেন এবং সেবা করলেন। তাই আমাদেরও উচিত দোয়ার পাশাপাশি রোগীর সেবার প্রতি খেয়াল রাখা। কেননা মানবসেবা পরম ধর্ম। সেবাই মানুষকে নিকটে টানে। অনেক সময় আমরা বিভিন্ন কবরস্থানে গিয়েও দোয়া করি। কবরে শায়িত ব্যক্তির মঙ্গল কামনার জন্য নবী করীম (সা.) আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন আর তাহলো **"আসসালামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইল্লা ইনশাআল্লাহ্ বিকুমুল্লা হিকুনা নাহুয়া ল্লাহু লানা ওয়ালা কুমুল আফিইয়াহ্"** অর্থ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এ অঞ্চলের মু'মিনগণ ও মুসলমানগণ! আল্লাহ্ চাইলে আমরাও অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তোমাদের জন্য এবং আমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। ইহা ছাড়াও আরেকটি দোয়া পড়া হয়ে থাকে, যেমন, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরে ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম আনতুম সালফুনা ওয়া নাহনু বিল আসরে" অর্থ : হে কবরের অধিবাসীবৃন্দ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আগে আগে যাও, আমরা তোমাদের অনুসরণ করছি। কবরস্থানে না গিয়েও কবরবাসীদের জন্য দোয়া কারা যায়। এ কবরে তো কেউ নেই। দেহ পঁচে গলে মাটি হয়ে গিয়েছে। যেহেতু কবরবাসীদের আত্মা এখনো জীবিত আছে তাই তাদের স্মরণে কবরে গিয়ে দোয়া করা হয়ে থাকে। আমাদের মধ্যে যারা চলে গেছেন তাদের সকলের জন্যই দোয়া করা উচিত। একদিন আমাদের সবাইকে এই নশ্বর দুনিয়া হতে চির বিদায় নিতে হবে।

আবার মাতা পিতার জন্যও দোয়া করতে বলা হয়েছে, যেমন রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা অর্থ : হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেভাবে করুণা কর যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছিলেন (সূরা বানী ইসরাঈল : ২৫)। প্রত্যেক ছেলে মেয়ের উচিত নিজের পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা কেননা তাদের মাধ্যমেই আমরা এই সুন্দর পৃথিবীতে এসেছি। আর তারা উভয়েই কষ্ট করে আমাদের প্রতিপালন করেছেন। নিজের জীবনকে জলাঞ্জলী দিয়ে সন্তানের দেখাশুনা করেছেন,

মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলেছেন। মনে রাখবেন দোয়া যাদুর মত কাজ করে। বর্তমান যামানার ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) দোয়ার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন, তিনি এক স্থানে বলেছেন, দোয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা অত্যাধিক শক্তি রেখেছেন। খোদা তাআলা ইলহামের মাধ্যমে বার বার আমাকে জানিয়েছেন যা কিছু হবে দোয়া দ্বারাই হবে। আমাদের হাতিয়ার তো দোয়াই। দোয়া ব্যতিরেকে আর কোন অস্ত্র আমাদের দেয়া হয়নি"। একটি কথা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে দোয়া করা আমাদের কাজ আর দোয়া কবুল করা খোদা তাআলার কাজ। খোদা তাআলা আমাদের অধীন নন বরং আমরাই তাঁর অধীন। তিনি আমাদের প্রভু এবং মালিক। কোন মালিক বা বাদশাহ্ যদি প্রজার প্রার্থনা মঞ্জুর না করেন তবে প্রজার কি-ইবা করার থাকে। তাই কোন দোয়া কবুল না হলে আমাদের নিরুৎসাহ হবার কিছুই নেই। আল্লাহ্ তাআলা রহমান এবং রাহীম। তিনি আলেমুল গায়েবও বটে। তিনি জানেন আমরা যে জন্য দোয়া করেছি তা কবুল করা হলে মঙ্গল হবে না অমঙ্গল হবে। আমাদের খোদা বিশালদর্শী। আমাদের ভাল মন্দ তাঁরই নখদর্পনে তিনি আমাদের স্রষ্টা। আমাদের ভালমন্দের খবর তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে। তাই দোয়া কবুল না হলে আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। দোয়া করে যাওয়াই শ্রেয়।

প্রত্যেক কাজের এক একটা মৌসুম হয়ে থাকে। সময় মত কাজ করলেই সুফল লাভ হয়। অসময়ে কাজ করলে সুফল লাভ তো হয়ই না বরং তদ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরূপভাবে দোয়ারও একটি মৌসুম বা সময় আছে।

নামাযের মধ্যেই দোয়া অধিক কবুল হওয়ার মোক্ষম সময়, বিশেষ করে যখন আমরা সিজদায় রত থাকি। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যখন কোন বান্দা সিজদায় থাকে, তখন সে আল্লাহ্ তাআলার অতি নিকটে থাকে। সুতরাং তখন বেশি করে দোয়া চাও (মুসলিম)। এ ছাড়া দোয়া কবুল হয় জুমুআর দিনে, সুবেহ সাদিকের পূর্বে, রমযান মাসে, লাইলাতুল কদর, আরাফাতের দিনে, ইফতার করার সময়ে, আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে, বৃষ্টিপাতের সময়ে, অসুস্থ অবস্থায়, সফরকালিন সময়ে, জেহাদের ময়দানে এবং যুলুম ও অত্যাচার বরদাশতকালীন ধৈর্য ধারনের সময়ে প্রভৃতি।

আমরা যদি একটি ইসলামী ইবাদত ও একটি দোয়ায়ে খাযায়েন বই সাথে রাখি তাহলে অতি সহজে এ দোয়াগুলো নিজে শিখতে পারবো এবং বাচ্চাদের শিখাতে পারবো। পরিশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করে আমার লেখা শেষ করছি। তিনি বলেছেন–

গায়ের মুমকিন কো ইয়ে মুমকিন মে বদল দেতি হায়

আর মেরে ফলসিফাও ! যোরে দোয়া দেখো তো।

অর্থাৎ–অসম্ভবকে ইহা (অর্থাৎ দোয়া) সম্ভব করে দেখায়

হে আমার দার্শনিক বৃন্দ! দোয়ার শক্তি দেখবে কি?

মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে দোয়া করার অভ্যাস সৃষ্টি করুন এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগ দান করুন, আমীন।

আল্লাহ্ পাকের দাসত্ব প্রসঙ্গে

খালিদ আহমেদ সিরাজী

আল্লাহ্ পাকের বান্দা বা দাস হওয়া সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় এই বিশ্বাসে কারো দ্বিমত নাই। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী নবী, রাসুলগণ, এবং খলীফাগণ কখনো আল্লাহ্ পাকের বান্দা হতে লজ্জাবোধ বা কুণ্ঠাবোধ করেন না। কারন খোদা তাআলার দাসত্ব ও গোলামী করা, তাঁর ইবাদত বন্দেগী করা, আদেশ নিষেধ পালন করা, সৌভাগ্যের ও মর্যাদা বিষয়। এক কথায় আল্লাহ্ পাক ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামী করা অমর্যাদার কাজ অর্থাৎ বিদআত।

বর্তমান বিশ্বে লক্ষ্য করা যায় খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে ঈশ্বর পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে মুশরিকরা ফিরিস্তাদের ঈশ্বর দুহিতা ও দেবী মুর্তি নির্মান করে পূজা অর্চনা করেছে। আবার মুসলমানদের অনেকে পীর প্রথা প্রচলন করে মাজারে, মাজারে দু'আ ও মানত করে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক এই ধরনের কাল্পনিক বিশ্বাসীদের হিসাব নিবেন।

পবিত্র কুরআন চুড়ান্তভাবে ঘোষনা দিয়েছে এই বলে, 'ফাদখুলী ফী ইবাদী ওয়াদখুলী জান্নাতি'- তোমরা আমার (আল্লাহ্‌র) দাসত্বের আওতায় প্রবেশ কর এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। এতে পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে প্রদত্ত সর্বশেষ পুরষ্কার হচ্ছে জান্নাত লাভ করা।

এই কাংখিত জান্নাত লাভের অন্যতম যোগ্যতাধারী হলেন আল্লাহ্ পাকের খাস বান্দাগণ ও আল্লাহ্ পাকের অনুগত দাসগণ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাকের অনুগত হতে হলে আল্লাহ্ পাকের আদেশ, নিষেধ ইহজগতে পালন করতে হবে। তারাই চুড়ান্তভাবে সফলতা লাভে সক্ষম হবেন। তাদের পরকালে ভয় নাই।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্ পাকের দাসত্বকে গ্রহণ করতে চায়না যুগের ইমামকে মানতেও চাননা, বরং অবাধ্যতা প্রকাশ করবে অহংকারে নিমজ্জিত হবে, আল্লাহ্ পাক তাদের সকলকে বিচার দিবসে জিজ্ঞাসিত ও বিচার করবেন এবং বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। তখন কোনক্রমেই আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পীর, ফকির অভিভাবক খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্ পাকের দাসত্বকে মেনে নিয়ে ঈমান আনয়ন করবে, সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করবে, এবং যুগের ঈমামকে মানবে, তারাই পরিপূর্ণ সওয়াব ও আল্লাহ্ পাকের ভালবাসা লাভ করবেন বরং তাঁর অনুগ্রহ পাবেন। লাভ করবেন আল্লাহ্ পাকের দীদার বা দর্শন। মনে রাখতে হবে, দাসত্বের চুড়ান্ত অভিব্যক্তি তখনই মানুষের মাঝে দেখা যায় যখন বান্দাহ্ সেজদায় নিপতিত হয়, এই সেজদারত অবস্থায় বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্ পাককে স্মরণের মাধ্যমে নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়।

এই অধিকতর নৈকট্য লাভ বান্দার জন্য আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভের পথকে সুগম করে চুড়ান্ত মঞ্জিলে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

তাই আল্লাহ্ পাকের দাসত্বকে স্বীকার করে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করা উচিত। আর এ প্রতিযোগিতা এমনই যে এতে কারও হার নেই।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ অনুষ্ঠিত ‘সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট’

সুধি পাঠক! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, হুযূর (আই.) এর নির্দেশক্রমে এখন হতে ‘সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট’ নামে পাক্ষিক আহমদী-তে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হবে, যারা অপারগতায় অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেন না বা দেখতে পারেন নি তারা এ অধ্যায় হতে অবশ্যই উপকৃত হবেন। কিন্তু সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে অনুষ্ঠান দেখার বিকল্প নেই। অ-আহমদী বন্ধুদের নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমেই এ অনুষ্ঠান সর্বাধিক সফল হতে পারে।

-মোহাম্মদ সোলায়মান, মুবাশ্বের মুরব্বী

বিঃ দ্রঃ এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত প্রশ্নোত্তর সরাসরি সম্প্রচারিত ‘সত্যের সন্ধানে’ অনুষ্ঠান হতে কাট ছাঁট ও সংক্ষেপ করে পাঠকের পিপাসা নিবারনের জন্য পেশ করা হয়েছে।
বিস্তারিত উত্তর শুনতে সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখুন বা আমাদের www.ahmadiyyabangla.org ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

প্রশ্নঃ আব্দুল মাবুদ, পশ্চিমবঙ্গঃ হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মটা অস্বাভাবিক ছিল তেমনি তার মৃত্যুটাও হবে আর তিনি কিয়ামতের অগ্রদূত হবেন। আপনারা কি কুরআন ও হাদীসের আলোকে তার কবর কাশ্মিরে আছে সাব্যস্ত করতে পারবেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আপনারা কি কবরের আযাবে বিশ্বাস করেন?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ আমরা কখনই কবরের আযাবের অবিশ্বাসী নই। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন “**আল্লাহুম্মা আনিস ওয়াহ্‌শাতী ফী ক্বাবরী।**” হে আল্লাহ তুমি আমাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা কর। আমরা এ দোয়া পাঠ করে থাকি আমরা কখনই কবরের আযাবকে অস্বিকার করি না। আমরা কেবল বলছি, সাড়ে তিন হাত মাটির কবরকে তোমরা যে এর জন্য ধরে রেখেছ আসলে তা নয়। আল্লাহ তালা আত্মার জন্য কবর নির্ধারণ করে রেখেছেন। যদি সে আল্লাহর নেক বান্দা হয়ে থাকে তাহলে সে ইল্লিইনে প্রবেশ করে আর যদি পুণ্যবান সাব্যস্ত না হন তাকে সিজ্জীনে প্রবেশ করানো হয়।

কুরআন শরীফে স্পষ্টভাবে লেখা আছে, “**ওয়া জাআলনাবনা মারইয়ামা ওয়া উম্মুহু আয়াতাও ওয়া আওয়াইনা হুমা ইলা রাবওয়াতিন যাতি কারারিও ওয়া মাঈন।**” (সূরা মু'মেনুন : ৫১) আমরা হযরত ঈসা (আ.) এবং তার মাতাকে নিদর্শন বানিয়েছিলাম। এবং তাদের উভয়কে এমন একটি উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দান করেছিলাম। যা বসবাসের উপযুক্ত স্থান এবং ঝরনা বহুল। ভূ-স্বর্গ ও ঝরনা বহুল স্থান যেখানে বনী ইসরাঈলের অন্য গোত্রগুলো ছিল সেই স্থান হলো ভারতের কাশ্মীর। আপনি বলেছেন কাশ্মীরে যে কবর রয়েছে এটি কোথাও আছে কিনা। কুরআনে কাশ্মীর নাম নিয়ে বলা নেই তবে যে বাক্য বলা আছে তাতে স্পষ্ট তিনি কাশ্মীরেই হিজরত করেছিলেন। **মওলানা ফিরোজ আলমঃ** আপনি আপনার কথায় বলেছেন ঈসা (আ.)-এর জন্মটা অস্বাভাবিক ছিল। এ স্থানে মনে রাখতে হবে ঈসা (আ.)-এর জন্মটি বিরল ঘটনা তবে এটি বলা যাবেনা এমন জন্ম আর কারো হয়নি। এখন তো বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ বিষয়ে বিষধ আসছে কোন পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই এক ধরণের টিউমারের কারণে কোন কুমারী নারী মা হয়ে যেতে পারে। অতএব এটি অসম্ভব নয় বা শুধুমাত্র ঈসা (আ.)-এর জন্য নির্দিষ্ট নয় এটি জন্মের একটি বিরল প্রক্রিয়া।

প্রশ্নঃ মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, খুলনাঃ *নবী আসতে পারে এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে কিছু আছে কিনা?*

মওলানা ফিরোজ আলমঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সকল অর্থে মুহাম্মদ (সা.)-কে খাতামান নাবীঈন হিসাবে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তাআলা নিজে তাঁকে এই সম্মান দিয়েছেন একে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। খাতাম শব্দের একটি অর্থ হলো নবীদের সকল গুণের আধার। আজ পর্যন্ত যত নবী অতিবাহিত হয়েছেন তাদের সকল বৈশিষ্ট হুযূর (সা.)-এর সত্তায় ছিল। এই কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে খাতামান নাবীঈন আখ্যা দিয়েছেন। আর খাতাম শব্দের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, আরবী ভাষায় যখন খাতাম শব্দ অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহার হয় বা অন্য কোন শব্দের সাথে খাতাম শব্দের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তখন এটি বিনা ব্যতিক্রমে শ্রেষ্ঠত্বের অর্থে ব্যবহার হয়। আর আরবী ভাষায় এর ভুরি

ভুরি উদাহরণ রয়েছে। হযরত আলী (রা.)-কে খাতামুল আউলিয়া বলা হয়েছে অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ওলী এর অর্থ কিন্তু এই নয় হযরত আলী (রা.)-এর পরে আর ওলী হবে না। উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে সকল ওলী হযরত আলী (রা.)-এর পরে হয়েছেন। হযরত আব্বাস (রা.)-কে খাতামুল মুহাজিরীন বলা হয়েছে এর অর্থ এই নয় যে তার পর আর হিজরত হয় নি? একইভাবে বু আলী সিনাকে খাতামুল আতিব্বা বলা হয়েছে অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। তাই বুঝা গেল মুহাম্মদ (সা.) নুবওতের এমন মার্গে উপনিত ছিলেন, এমন পরাকাষ্ঠ অর্জন করেছিলেন যা অন্য কোন নবী পূর্বে অর্জন করতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। এই অর্থে তিনি (সা.) খাতামান নাবীঈন আমাদের এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি অতুলনীয়। এই শব্দের অর্থ তিনি (সা.) বেশি বুঝতেন। তিনি খাতামান নাবীঈন হওয়ার পরও নিজের উম্মতদের তাঁর পর উম্মতি নবী আসার কথা বলেছেন, মুসলিম শরীফে চার বার বলেছেন ঈসা নবীউল্লাহ হবেন, রাসূল (সা.) কি **'খাতাম'** শব্দের অর্থ জানতেন না? অবশ্যই জানতেন। **'খাতাম'** শব্দের অর্থ এই নয়, রসূল (সা.) চিরতরে নেয়ামতের দার বন্ধ করে দিয়েছেন। বরং তিনি (সা.) তো নেয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন।

প্রশ্নঃ লায়েক আহমদ, মিরপুরঃ *ইন্দোনেশিয়াতে যে আহমদীদের হত্যা করা হয়েছে তাদের প্রতি আমি সমবেদনা যানাচ্ছি এবং তাদের জন্য দোয়া করছি। প্রশ্ন হচ্ছে মুসলমানরা যেহেতু আমাদের হত্যা করছে ইসলামের দৃষ্টিতে এটি কিরূপ। তারা কিসের ভিত্তিতে এই কাজটা করছে?*

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ এখানের মোল্লারা এটাই বুঝাচ্ছেন, এরা ইসলামের সাথে সম্পর্ক রাখে না। অনেকে বলবেন কেন? আমরা কলেমা পড়ি, নামায পড়ি, রোযা রাখি, বড় দাড়ি, বড় জুব্বা পড়েছি আমাদের মধ্যেই ইসলাম রয়েছে। আড়ম্বরপূর্ণ মসজিদগুলো মুসল্লী ভরা। আমরা ইসলাম পালন করছি না এ কেমন কথা? এর উত্তর হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার ঘটনা। কাঠ মৌলবীরা যে আচরণ শিখিয়েছে সাধারণ মুসলমানরা মনে করছে মারা মারি কাটা কাটি করাই এদের কাজ। হুযূর (সা.)-এর শিক্ষা হলো, আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেও মানুষের লাশ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেনা। শত্রু পক্ষের লাশ বিক্রিত করা অর্থাৎ কখনো নাক, কান, গলা কাটা এসব ছিল কাফিরদের বৈশিষ্ট। তাই হুযূর (সা.) বলেছেন তোমরা মুসলমান তোমাদের কাজ হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং তোমরা কখনও লাশ নিয়ে লাশকে অসম্মান করবে না। ইহুদির মতো জাতির শত্রু পক্ষের লাশ যাচ্ছিল হুযূর (সা.) উঠে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, লোকেরা স্মরণ করিয়েছেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল এটিতো ইহুদির লাশ। হুযূর (সা.) বলেছেন, সেকি মানুষ ছিলো না? **"ওয়ালাকাদ কাররামনা বানী আদামা"** আল্লাহ্ বলেন, মানুষকে আমি সম্মানিত করেছি। যে মত ও পথেরই হোক না কেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কথা যদি সহ্য না হয় এই জামাতের যুক্তিকে খন্ডন কর, কুরআনের আলোকে আমাদের ভুল দেখিয়ে দাও। তা না করে আমাদের নিরিহ আহমদীদেরকে টেনে হিচরে বের করে প্রথমে হত্যা করা তারপর বাশ দিয়ে পিটিয়ে লাশ বিক্রিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এমন ঘটনা ঘটেছে ৩১ শে অক্টোবর ২০০৩-এ শুধু মাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাখ্যা গত তারতম্যের কারণে হকিষ্টিক দিয়ে ইমাম শাহ আলমকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। ধর্ম একই ইসলাম শুধু দেখতে হবে করা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ পালন করছেন।

প্রশ্ন ঃ মেরাজ নাজির – *আমরা সাধারণত জানি ইসলামে সব মানুষকে সমানভাবে দেখা হয় এখানে বৈষম্য করা হয় না তাও আমরা আশরাফ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট নামে দুটি শব্দ পাই, আমার প্রশ্ন হচ্ছে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এ বিষয়টাকে কিভাবে দেখে?*

মওলানা ফিরোজ আলমঃ আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে, মানুষ হিসেবে সবাই সমান সম্মানিত, সে যে ধর্মেরই অনুসরণ করুক না কেন। কিন্তু কুরআন করীমে অধিক সম্মানিত হওয়ার একটা মাপকাঠি প্রতিষ্ঠা করেছে আর তা হল তাকওয়ার বৈশিষ্টে সজ্জিত হওয়া। অর্থাৎ খোদার ভীতি এবং খোদার ভালোবাসার ঐশি গুনাবলিতে তোমাকে সজ্জিত হতে হবে।

মানুষের প্রতি সহানুভূতি, ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে। কুরআন করিমে বলা হয়েছে, **"ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতক্বাকুম"** (সূরা আল্ হুজুরাত : ১৪)। খোদার দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সে সবচেয়ে সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি। অর্থাৎ যার ভেতর মানবিক গুনাবলি সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে উত্তম সে-ই সবচেয়ে সম্মানিত। এই আয়াতগুলোর প্রেক্ষাপটে যে আয়াতগুলো আছে সেগুলোর দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারি সেখানে আল্লাহ্ বলছেন যে, কোন পুরুষের উপর তার প্রাধান্যের কথা বলো না বা কোন পুরুষ জাতি অন্য পুরুষ জাতিকে যেন হেও মনে না করে। কোন নারী অন্য নারী জাতিকে যেন হেয় মনে না করে। হতে পারে খোদার দৃষ্টিতে তারা যাদের হেয় মনে করা হচ্ছে তারা উত্তম এর পরের আয়াতে খোদা তাআলা বলছেন ছোট বড় যে ভেদাভেদ এটি সব মানুষের সৃষ্ট। খোদার দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন। খোদার দৃষ্টিতে সম্মানিত কেবল সে যে খোদার দৃষ্টিতে মুত্তাকী। যে খোদা ভক্ত, যে খোদাকে ভয় করে। যার ভিতর মানবিক গুনাবলি সবচেয়ে বেশি, যে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে জানে, যে ধর্মের নামে পাশবিক আচরণ করে না সে-ই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অধিক সম্মানিত।

প্রশ্ন ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাংবাদিক এম এ মান্নান ঃ ঈদ-এ-মিলাদুন্নবীর প্রয়োজনীয়তা আছে কি নাই? আপনারা ঈমাম মাহদীর আগমন সম্বন্ধে বিশ্বাস করেন কিন্তু বড় বড় আলেম ওলামা বিশ্বাস করেন না, আমরা কার কথা শুনবো?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে হুযূর (সা.) তার জন্ম তারিখ উল্লেখ করে কোন দিবস উৎযাপন করার শিক্ষা দেন নাই। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তাঁর জন্ম তারিখে জন্ম দিবস পালন করেন নাই। অতএব আমরা মুসলমানরা রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে শিখতে পেলাম। যদিও তিনি সবচেয়ে বড় রাসূল ছিলেন সবচেয়ে বড় নবী ছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং সর্বশেষ শরীয়তবাহক ছিলেন, সম্পূর্ণতম মানব ছিলেন, আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নৈকট্য প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি যেহেতু তার জন্ম দিবস পালন করেন নাই, করতে বলেন নাই, করতে শিখান নাই তাই আমরাও করি না। হুযূর (সা.)-এর মৃত্যুর পর খলিফাতুল রাসূল হযরত আবু বকর (রা.) তিনিও তাঁর (সা.)-এর জন্মদিবস পালন করেন নাই। খলিফাদের সুন্নত দ্বারাও এটা সাবস্থ্য হয় না। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে, হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে এবং হযরত আলী (রা.)-এর যুগেও সাব্যস্ত হয় না। আমরা তাহলে কি শিখলাম সবচেয়ে বড় নবী সবচেয়ে বিশ্বস্ত নবী, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নবী (সা.) নিজের আচরণ দ্বারা বুঝিয়ে গেলেন আমি যত বড়ই হই না কেন তোমাদের দৃষ্টিতে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সম্মানিত হয়েও আমার জন্ম দিবস পালন করার রেওয়াজ আমি তোমাদের দিয়ে গেলাম না।

আর সবচেয়ে বড় মুসলমান যারা ছিলেন যারা রাসূল (সা.)-এর সাহাবী ছিলো যাদের রাসূল (সা.)-এর প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ছিলো তাদের কাছ থেকে আমরা শিখলাম। যদিও রাসূল (সা.)-এর প্রেম সবচেয়ে বেশি তাদের মধ্যে ছিলো কিন্তু তারাও সেই প্রেমের দাবি অনুযায়ী রাসূল (সা.)-এর জন্ম দিবস পালন

করেন নাই। প্রেমের দাবী হচ্ছে রাসূল (সা.) যা করেছে সেটা করা। আর যা করেন নাই বা করতে বলেন নাই সেটা কর না। এটা হচ্ছে আহমদীদের শিক্ষা। তাই তারা পৃথক কোন ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী করে না। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর পবিত্র জীবনী আমরা অবশ্যই আলোচনা করি এবং সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করি, হুযূর (সা.) কিভাবে সত্য প্রচারের জন্য কষ্ট করেছিলেন, কিভাবে মানুষকে আহবান জানিয়ে ছিলেন, শত্রুরা কি করেছিলো, কাফেরদের আচরণ কেমন ছিলো, বিশ্বাসীরা কত কুরবানী করে আমাদের কি করা উচিত এই যে আলোচনাগুলো এ সব কিছু চলতে থাকে এজন্য কোন দিন বা ক্ষণ নির্ধারিত হওয়ার দরকার নেই। তাই ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী সম্পর্কে আমাদের বিনীত বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) যেহেতু করেন নাই, খোলাফায়ে রাশেদা যেহেতু এ দিবস পালন করেন নাই আমরাও করি না।

ভিডিও প্রশ্ন ঃ ইসলাম অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে কিরূপ ধারনা পোষন করে?

মওলানা ফিরোজ আলমঃ ইসলাম পৃথিবীর সব ধর্মের সাথে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানে বিশ্বাসী। সকল ধর্মের মান্য কারীদের নিজ নিজ ধর্মানুসারে চলা এবং শান্তিপুর্ণভাবে প্রচারের প্রসারের অন্যের মন জয় করার চেষ্টা করার, অন্যের নিজ ধর্মের জন্য জয় করার চেষ্টা করার পুরো অধিকার ইসলাম দিয়েছে। ইসলাম অতি পরিষ্কারভাবে ঘোষনা করেছে যে **"ওয়া কুলিল হাক্কু মির রাব্বিকুম ফামান শাআ ফাল ইউ'মিন ওমান শাআ ফাল ইয়াকফুর"**। (সূরা আল্ কাহ্‌ফ : ৩০) ইসলাম হিসেবে মুহাম্মদ (সা.) যে ধর্ম পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন সেটি সত্য এতে কোন সন্দেহ নেই যার ইচ্ছা এটিকে অস্বীকার করুক যার ইচ্ছা একে বর্জন করুক। তার মানে অন্য ধর্মের অনুসারীদের পুরো স্বাধীনতা আছে ইসলামকে বর্জন করার, ইসলামকে গ্রহণ না করার এবং সূরা কাফেরূন-এ পরিষ্কার ভাবে আছে, **"লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দিন"** যে তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য আমার ধর্ম আমার জন্য। পুরো স্বাধীনতা দিয়েছে এবং কুরআন বলে যে কারো কাছে যদি সত্য থাকে, সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক, যুক্তির মাধ্যমে আর কেউ যদি সত্য বর্জিত হয় বা সত্য শূন্য হয় সেই সত্য শূন্য তার কারণেই হয়।

কোন ব্যক্তির হাতে, কোন মুসলমানকে এ অধিকার দেয় নি যে তুমি নিজেকে সত্য মনে কর, তাই অন্য ধর্মকে তুমি মিটিয়ে দাও। মোটেই নয়, ইসলাম শান্তির ধর্ম, শান্তি পূর্বভাবে পৃথিবীর সকল ধর্মকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম ও নিজ নিজ প্রচারের অধিকার দেয়। আমরা রাসূল (সা.)-এর জীবনে এটি দেখতে পাই। মদীনাতে নিজের মসজিদে খৃষ্টানদের সাথে কথা বলছিলেন। খৃষ্টানরা এক পর্যায়ে বলল আমাদের তো এখন ইবাদতের সময় হয়ে গেছে আমরা একটু বাহির থেকে ইবাদত করে আসি। রাসূল (সা.) কিন্তু এটা বলেননি, যে না না তোমাদের তো এখন নিজ ধর্ম মানার অনুমতিই নাই। এটি তিনি বলেন নি। রাসূল (সা.) বলেছেন, আরে বাহিরে যাওয়ার কি দরকার এটি মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর এখানে তোমরা ইবাদত কর, তোমাদের রীতি অনুসারে। তো এর থেকে উত্তম দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে। ইসলাম পৃথিবীর সকল ধর্মকে তাদের মত, পথ এবং প্রচার-প্রসার ও চলার অনুমতি দিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ জিয়া উদ্দিন, মিরপুর – আমার বন্ধু বলে, মহানবী (সা.)-এর মিরাজ হয়েছে কিন্তু আহমদীরা বিশ্বাস করে না। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) তো হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চেয়ে ছোট নবী হয়েও আল্লাহ্‌র সাথে সরাসরী সাক্ষাত করেছেন।

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ আমরা বিশ্বাস করি মেরাজ সত্য এবং আল্লাহ্ তাআলার সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাক্ষাত হয়েছিলো। আর কোন নবীর সাক্ষাত হোক বা না হোক মহানবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাক্ষাত তো অবশ্যই হয়েছে। হযরত জীব্রাঈল যিনি ফেরেশতাদের নেতা তাকে ছাড়িয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর সাক্ষাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি মিরাজ একটি আধ্যাত্মিক দিব্য দর্শন কাশফ। কেন? যেন সবচেয়ে বড় নবীকে দেখান কতটুকু আধ্যাত্মিক মার্গ তুমি অর্জন করেছ, আল্লাহ তাঁকে কতুটুকু কাছে জায়গা দিয়েছেন। ১ম আকাশে হযরত আদম (আ.), ২য় আকাশে হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর ভাই। এভাবে এক এক আকাশের বিবরণ আছে এবং শেষে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে অতিক্রম করলেন এবং সপ্তম আকাশে উপনিত হওয়ার পর জিবরাঈল (আ.) বললেন এখন আমিও আর এগোতে পারবো না। এখানে আমার সীমা শেষ। আর সেই শেষ মার্গে চরম এবং পরম উৎকর্ষ স্বাধনকারী নবী ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আমরা শুধুমাত্র দৈহিক মিরাজে বিশ্বাস করি না কেননা আল্লাহ তাআলা সব জায়গায় বিরাজ করেন, তার কাছে দৈহিক ভাবে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব একথা বলা ঠিক না যে আহমদীরা মিরাজে বিশ্বাস করে না। আমরা অবশ্যই মিরাজে বিশ্বাস করি। সূরা নজমে মিরাজ সমন্ধে উল্লেখ আছে। অতএব মিরাজ সত্য এবং মিরাজ-এর ঘটনা সত্য। শুধুমাত্র এর যে ব্যাখ্যা করা হয় 'দৈহিক' সেটার সাথে কুরআন একমত নয় বলে আমরা একমত নই।

আর রইল বাকি মূসা (আ.)-এর মিরাজ এর সাক্ষাত, ভালো করে ঘটনাটা পড়েন, তিনি বলেছেন, হে আমার আল্লাহ্ তোমাকে আমি দেখতে চাই, আমি তোমাকে দেখে নিজেকে ধন্য করতে চাই। আল্লাহ্ বলছেন **"লানতারানি"** (সূরা আল্ আ'রাফ : ১৪৪) তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবেনা। যার কাছে আমি প্রকাশিত হতে যাচ্ছি। আল্লাহ্ বলেন, এ পাহাড়ের দিকে তাকাও যদি পাহাড় টিকে থাকে নিজ স্থানে তুমি অবশ্যই আমাকে দেখতে পারবে। আল্লাহ তাআলা তাজাল্লী প্রকাশ করলেন, নিজের জ্যোতির একটা সামান্য ঝলক দেখালেন আর পাহাড় ধ্বংশ হয়ে গেল। "ওয়া খায়রা মূসা সারেকা" দেখাতো দূরের কথা দেখার আগে অজ্ঞান হয়ে বসে আছেন। হযরত মূসা (আ.) কখন দেখলেন। এটা মূলত মুহাম্মদী বিকাশের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তোমার ভাইয়ের মধ্য থেকে তোমার অনুরূপে নবী আবির্ভূত করব এবং তোমার মত এক ভাববাদী নবী হবে তার হাতে শরীয়ত থাকবে এবং তাকে যারা না মানবে তাদের হিসাব আমি গ্রহণ করব। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি দ্বিতীয় বিবরণীর ১৮ অধ্যায়ের ১৮ পদে উল্লেখ রয়েছে। তাই হযরত মূসা (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তুমি পূর্ণ আকারে কিভাবে বিকশিত হবে আমি সেই বিকাশ দেখতে চাই । আল্লাহ বলছেন, তোমার সামর্থ নাই এটা সহ্য করার। কিন্তু আমাদের নবী বিশ্বনবী (সা.) সে তাজাল্লী গ্রহণ করেছিলেন,

"ওয়া হা মালাহাল ইনসানু ইন্নাহু কানা জালুমান যাহুলা" (সূরা আহযাব : ৭৩)

"লাও আনজালনা হাজাল কুরআনা আলা জাবালিল্লা রাআই তাহু খাশিয়া মুছাদ্দি আম্মিন খাস ইয়া তিল্লাহ্" । (সূরা হাশর : ২২)

যদি আমি এ কুরআন বাহ্যিক কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম যে পাহাড় সে পর্বত ভেঙ্গে ধ্বংস হয়ে চৌচির হয়ে যেত। যেটার ঘটনা হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে ঘটেছে। কেন? কুরআনের বিকাশ এই তাজাল্লী মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া হয় কেন? মানুষ নবী গ্রহণ করতে পারে না। উনি কখন দেখলেন আল্লাহ্ তাআলাকে আল্লাহ্‌র সে রূপ একমাত্র দেখার ছিলো মুহাম্মদ (সা.) এবং তিনি তার আন্তরিক অন্তরের চোখে দেখেছিলেন। এই জন্যই আমরা বলি **"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিও ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামিদুম্মাজিদ।"**

নবীনদের পাতা

আসুন! আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরি

আনোয়ার আহমদ

কোন মহৎ কাজের সফলতা বা লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে এর জন্য নানান বাধাবিপত্তির সম্মুখিন হতে হয়। আর অনেক দু:খ যাতনা ভোগ আর অতিক্রম করতে হয় মহান রাব্বুল আলামীন নির্ধারিত বহুবিদ পরীক্ষার। আল্লাহ্ তাআলা লক্ষাধিক যত নবী রাসূল পাঠিয়েছিলেন তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানবজাতিকে হুশিয়ার করা, খোদা তাআলার প্রকৃত পরিচয় করে দিয়ে সত্য ও সৎ পথে নিয়ে আসা এক কথায় আধ্যাত্মিকভাবে মৃত জাতিকে জীবিত করে তোলা। এ ধারাবাহিকতায় দেখা যায় বিগত প্রায় সাড়ে ১৪ শত বছর পূর্বে আরবের বুকে মানবজাতির ভাগ্যাকাশে এক পূর্ণিমার চাঁদ [মুহাম্মদ (সা.)] উদয় হয়েছিল, যে চাঁদের কিরণ বা প্রভাব ব্যক্তি, সমাজ ও বিশ্ব সমাজকে আলোকিত করতে সক্ষম ছিল কিন্তু আফসোস তাঁকে গ্রহণ করে রূহানীভাবে ধন্য হওয়ার পরিবর্তে নগণ্য কিছু লোক ছাড়া পুরো সমাজ তাঁর বিরুদ্ধাচরণে ঝাপিয়ে পড়ে এমনকি তাঁর প্রাণনাশ করার পরিকল্পনা করতেও বাদ দেয়নি। এর একমাত্র কারণ হলো তারা মনে করতো মুহাম্মদ (সা.)-এর দাবী (নাউযুবিল্লাহ্) সত্য নয়। উপরন্তু নিজেদেরকে ঈমানদার ও সত্য মনে করে এরকম জগণ্য আচরণ করে যেতো। আরও মনে করতো যে, সে একজন চির এতিম, মূর্খ এবং আর্থিক দিক দিয়েও দুর্বল এ ব্যক্তি আবার কিভাবে নবী হয়। সেতো নবুওয়াতের দাবী করে আমাদের বাপদাদার ধর্ম নষ্ট করতে বসছে।

সমস্ত নবীদের সমকালীন যুগে এরকমই ঘটেছিল যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে স্বয়ং তার পিতা আজর বলেছিল তুমি যদি তোমার তবলীগ (প্রচার) বন্ধ না কর তবে তোমাকে পাথর মেরে সাধ মেটাব (সূরা মরিয়ম : ৬২) এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখার বিষয় হলো যাদের নিকট আল্লাহ্ পাক সার্বিক মঙ্গলার্থে মুহাম্মদ (সা.)-কে নবী মনোনীত করলেন তাঁকে স্বচক্ষে দেখে মানতে ও চিনতে পারে নাই, আজ সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর পর আমরা না দেখে যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত বলে দাবী করি তারা কতটুকু চিনেছি এটা এখন গভীর উপলব্ধির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা শুধু নাম বংশ আর ইসলামী আচার অনুষ্ঠান করা যথেষ্ট নয়। কারণ আজ বিশ্বের মুসলমান যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শে আদর্শবান হতো তাহলে নামধারী মুসলমান আজ আর শত ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হতো না এবং দলাদলী করে দূর্বল হয়ে পড়তো না। তাই আল্লাহ্ পাক পূর্বেই হুশিয়ার করে দিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধর পরস্পর বিভক্ত হয়ো না (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)। কলহ বিবাদে লিপ্ত হয়ো না অন্যথা দুর্বল হয়ে পড়বে (সূরা আনআম : ৪৭) এতে স্পষ্ট বলা যায় যে, পবিত্র কুরআনকে কষ্টিপাথর ধরে যদি আমাদেরকে যাচাই করা হয় তাহলে সারা দুনিয়ার মুসলমান কুরআন মান্যকারী নাকি উল্টা পথের যাত্রী বিষয়টা বুঝতে আর বেশী সময়ের প্রয়োজন হবে না, সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ আমাদেরকে আরো ১টি বিষয় পরিষ্কার বুঝে নিতে হবে যে, মহানবী (সা.)-এর তবলীগ কি ছিল এর উদ্দেশ্যই বা কী? কারণ আজ সারা বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে "তবলীগ জামা'ত" নামে এক দ্বীনি দাওয়াতী মেহনত চলছে যা শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অন্য সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে দাওয়াত দেওয়া প্রয়োজনই মনে করে না। যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর অতি মহান শান, সত্যতা এবং মর্যাদা ভিন্ন জাতির কাছে তুলে না ধরে তাহলে এ তবলীগ হবে তেল্লা মাথায় তেল ঢালার নামান্তর। অথচ মুহাম্মদ (সা.)-এর তবলীগ ছিল তিনি যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সত্য নবী মনোনীত হয়েছিলেন এবং তাঁর রেসালত গোটা মানবজাতির কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও সুখ শান্তির কারণ। এ সংবাদ তিনি সমাজের আপন পর সর্বস্তরের মানুষের কাছে প্রচার করতেন এবং দূর দুরান্তের রাজা বাদশাহ্‌র নিকট দূতের মাধ্যমে নবুওয়াতের কথা পত্রে লিখে পাঠাতেন, এ ছিল তাঁর (সা.)-এর তবলীগ। তাঁর (সা.)-এর তবলীগের প্রতিক্রিয়া কি হবে আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে কুরআন মজীদে জানিয়েছেন যে, হে রাসূল তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও.....আল্লাহ্ মানুষের কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করবেন (সূরা আল মায়েদা : ৬৮)। তখন তাঁর তবলীগকে মেনে মুসলমান হওয়া এত সহজ সাধ্য ছিল না। যখনই কেউ মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতেন তখনই শুরু হয়ে যেতো তাঁর উপর অগ্নি পরীক্ষা। হযরত বেলাল (রা.) এবং হযরত খাবাব (রা.)-এর কথা কে নাজানে! হযরত বেলাল (রা.) যখন ঈমান এনেছিলেন তখন তার মালিক মরুভূমির প্রখর রোদে উত্তপ্ত বালুর উপর চিৎ করে শোয়াত, বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দিতো, পাষানেরা রাতদিন পিটাই করতো, গলায় রশি বেধে অলিগলিতে টানা হেঁছড়া করতো। এ নিদারুন কাহিনী পুস্তক পাঠেও জানা যায়, ওয়াজ বয়ানেও শুনা যায় যা সম্পূর্ণ গলাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এর বাস্তব যে কত কঠিন ও করুন তা বক্তা আর শ্রোতা কেউ কি জানে? সত্য দ্বীনের জন্য এখনও যে বাতেলের পক্ষ থেকে নির্যাতন চলছে আর সত্যান্বেষীরা নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে। নিজেরা যে ঐ রকম কুরবানী দিতে হবে সেই মন মানসিকতাও নেই। এমন কি বিগত যুগগুলিতে যখন ধর্মে নানান অনাচার ও বিকৃতি দেখা দিয়েছিল তখন সত্য প্রচার ও প্রসারের জন্য আল্লাহ্ পাক যাঁকে খাড়া করেছিলেন তখন তাদের উপরও হিংস্র স্বভাব নিয়ে আক্রমণ শুরু করে দিতো যথা হিজরী ২য় শতাব্দীতে হযরত ইবনে আবু হানিফা (র.)-কে তাঁর সমকালীন মোল্লা মৌলভীরা জিন্দিক ও কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছিল। মিথ্যা এলযাম সাজিয়ে বন্দী করে কয়েদী অবস্থায় বিষ প্রয়োগে হত্যা করে এবং কবর থেকে লাশ তুলে পুড়ে ফেলে (সীরাতে নোমান) একই শতাব্দীতে ইমাম বাকী (র.)-কে সমকালীন মোল্লারা কাফের ইবলিসের ফতোয়া দিয়ে গর্দানে শিকল পরিয়ে নগ্ন পদে হেঁটে কুফা হতে মদীনা পর্যন্ত নিয়ে

গিয়েছিল। হিজরী ৩য় শতাব্দীতে হযরত ইমাম হাম্বল (র.)-কে মৌলবীদের প্ররোচনায় ২৭ বছর পর্যন্ত জেলে রাখা হয়েছিল, ৪টি শিকল বাঁধা অবস্থায় প্রত্যহ কোরা মারা (চাবুক) হতো। ৬ষ্ঠ শতাব্দী হিজরীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এর বিরুদ্ধে ঐ যামানার ওলামাগণ কাফের ও মুরতাদ বলে এত শক্ত ফতোয়া দিয়েছিল যে, যারা তাঁকে কাফের না বলবে তারাও কাফের হয়ে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ্.....) যুগে যুগে এ হলো মোল্লাতন্ত্রের ফসল আর চেহারা।

আজ সারা বিশ্বের মুসলমান মহানবীর (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে যুগের মহান সংস্কারক হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের অপেক্ষায় দিন গুণছে। কিন্তু উপরোক্ত উদাহরণ থেকে কি বুঝা যায় না যে, যখনি আল্লাহ্ পাক যাঁকে যেখানেই গোটা মানবজাতির সংশোধনের জন্য ইমাম মাহ্‌দী হিসেবে মনোনীত করবেন, তাঁকে সহজে কেউ বরের মত স্বাগতম জানাবে না। কথাটির সমর্থনে, পওয়া যায় ১১শ শতাব্দীর ইমাম মোজাদ্দেদ আলফেসানী (র.) বলেছেন ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সূক্ষ্ম ও তত্ত্বপূর্ণ মূল্যবান ব্যাখ্যাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে সম সাময়িক ওলামাগণ ঐগুলোকে কুরআন ও সুন্নার বিরদ্ধে মনে করে তাঁকে (আ.) অস্বীকার করবে। (মকতুবাতে ইমাম রাব্বনী ২য় খন্ড, ৫৫ পৃ:)

দিল্লী দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা কাশেম নানুতবী (রা.) তিনিও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। খুব সম্ভব সবাই জানেন যে খৃষ্টান আকিদা বিশ্বাস হলো তারা ত্রিত্ববাদী অর্থাৎ তিন খোদায় বিশ্বাসী (নাওযুবিল্লাহ্) আর মুসলমান এক খোদার বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ঈমানী দুর্বলতার কারণে ঈসা (আ.)-কে আকাশে জীবিত আছে মনে করে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে খৃষ্টান পাদ্রীরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে ছলে বলে কৌশলে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে বেশী বেগ পেতে হয়নি। অনেক আলেম পর্যন্ত তাদের শিকারে পরিণত হয়েছিল তখন তাদের সামনে দলিল বা যুক্তিতে দাঁড়ানোর মত কোন মায়ের সন্তান ছিল না। চতুর্দিকে তাদের যখন জয় জয়াকার চলছিল তখন খৃষ্টান পাদ্রী জন হেনরী রুজ খৃষ্টধর্মের উন্নতি সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন অদূর ভবিষ্যতে কায়রো দামেস্ক তেহরান যীশু খৃষ্টের সেবকবৃন্দ দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে, এমন কি মক্কানগরীর কাবা গৃহে প্রবেশ করে তারা ক্রুশ ধর্মের অনন্ত জীবনের বাণী উচ্চারিত করবে। (Christianity The world religion)

মুসলমানদের হেনস্তা করতে খৃষ্টানদের নিকট বড় দলিল বা মূল বিষয় হলো শুধু বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত নবী ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত থাকা শেষ যামানায় তাদের অবক্ষয় থেকে উদ্ধারের জন্য নেমে আসা। আর তাদের সাথে সুর মিলিয়ে অপেক্ষা করছেন মুসলিম জাতি। অথচ এর কোন প্রমাণ না আছে কুরআন মজীদে, না হাদীসে, না বাইবেলে। তবে কুরআন মজীদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র এক প্রশ্নের জবাবে ঈসা (আ.) বলবেন, আমি যত দিন আমার জাতির নিকট ছিলাম আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম (অর্থাৎ তারা আমাকে খোদা বলে জানতো না) কিন্তু তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের উপর তত্ত্বধায়ক ছিলে। (সূরা মায়েদা : ১১৭-১১৮)

হযরত ঈসা (আ.)-কে যারা আকাশে জীবিত মনে করেন তাদের বিশ্বাস মতে যখন তিনি (আ.) আকাশ থেকে নেমে আসবেন তখন দেখবেন যে, তাঁর জাতি ঈসা (আ.)-কে খোদা জ্ঞান করে রীতিমত পূজা করে চলছে। সেক্ষেত্রে কি করে বলবেন যে,আমার মৃত্যুর পর আমার জাতির কিছুই জানি না। এখন চিন্তা করুন আপনাদের ঈমান আকিদা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। বোকার স্বর্গে আর কতকাল কাটাবেন! সারা পৃথিবীতে আজ একদিকে দ্বন্দ্ব সংঘাত কলহ বিবাদে জ্বলছে আগুন, চলছে রক্ত ঝরার হোলি খেলা। অপর দিকে খোদা তাআলার পরিকল্পনার আলোয় হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) সমস্ত জাতির নানান ধর্মীয় বলয়ে পালনকারীদেরকে এক মোহনায় এনে ঘটাবেন মানুষের মিলন মেলা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি ছিল "তিনি তাঁকে [মোহাম্মদ (সা.)]-কে আখেরী উম্মতের মধ্যে আবির্ভাব করাবেন" (সূরা জুমুআ : ৪) এ আবির্ভাব সম্পূর্ণ আত্মিক ও আদর্শের বিকাশ হওয়ায় তথা ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর মাধ্যমে তাই যথা সময়ে আল্লাহ্ পাক ইসলামের এমন দুর্দিনে কুরআন ও মুহাম্মদ (সা.)-এর শান ও মর্যাদা রক্ষা কল্পে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। যার উপর এলহাম হয়েছিল কুল ইন্নি উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মু'মিনীন অর্থ, তুমি বল নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই ১ম বিশ্বাসী।

তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তিনি ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ সালে ৪০ জন পুণ্যাত্মা ব্যক্তির বয়আত নিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করে অগ্রযাত্রা শুরু করেন। সারা পৃথিবীতে আজ উক্ত জামা'ত বিস্তার লাভ করে (২৫) কোটি সদস্যে দাঁড়িয়েছে। আর মিথ্যা দাবীদার হলে নিজ জীবদ্দশাতেই সমূলে ধ্বংস হয়ে যেতো। কারণ আল্লাহ্ পাক বলেন, আমরা তার জীবন শিরা কেটে দিতাম (সূরা হাক্কা : ৪৭) তাঁর দাবী ছিল একাধারে মুসলমানদের জন্য মাহ্‌দী, খৃষ্টানদের জন্য ঈসা, হিন্দুদের কল্কি অবতার বৌদ্ধদের মৈত্রীয়, কারণ প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ ধর্মে এক মহামানবের আবির্ভাবের কথা আছে। তাই যদি হয় কুরআনে ঘোষণা "সকল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় হবে, (সূরা সাফ : ১০, সূরা ফাত্‌হ : ২৯) যদিও প্রত্যেক ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন নামে মহামানবগণের আবির্ভাবের কথা, তথাপি ঐ মহামানব সকল ধর্মের সমন্বয়ে মাত্র একজনই। যিনি গোটা মানবজাতির কুরআন তথা ইসলামিক কেন্দ্রবিন্দু যা আজ সারা বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জামা'তের মধ্যে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। এরপরও দাবীদারকের দাবীর সাথে অতীতের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী সারা পৃথবীর মোল্লা মৌলবী কুফরী ফতোয়া দিয়ে শুরু করল নানান ষড়যন্ত্র আর জঘন্য রকম হামলা। খৃষ্টান পাদ্রীরা অমৃত শহরে (ভারত) ইংরেজ কোর্টে সাজিয়ে দিল মিথ্যা মামলা (১লা আগষ্ট ১৮৯৭)। পাকিস্তানে ১৯৭৪ সাল হতে আহমদীয়া জামা'তের উপর ফেরাউন নমরূদ থেকেও ঘৃণীত আচরণ কায়েম করেছিল ভুট্টো জিয়াউল হক। যার ফলে আহমদীরা ইসলামের অনুশাসন আর কলেমা পাঠ করতে গিয়ে কালো আইনের কবলে পড়ে যেতে হলো জেলে, দিতে হলো তাজা প্রাণ। যাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এখনো অব্যাহত আছে। বাংলাদেশে বিগত কয়েক দশকের মধ্যে যে অমানবিক আর অমানষিক কর্মকান্ড ঘটেছিল ইতিহাসে তা কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে। যেমন নভেম্বর ১৯৬৩ সালে বি. বাড়ীয়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সালানা জলসার বক্তৃতা কালীন মোল্লা মৌলবীদের অতর্কিত হামলার কবলে পড়ে

শহীদ হয়ে যায় আব্দুর রহীম ও আব্দুল গনী। রক্তাক্ত হয়েছিল আরও অনেকে। ঐ জিলায় ১৯৮৭ সালে আহমদীদের টাকায় নির্মিত কান্দি পাড়ার দোতলা মসজিদটি এখনো মোল্লা মৌলবীদের জবর দখলে। ২৯ অক্টোবর ১৯৯২ তারিখে বকশী বাজার ঢাকা কেন্দ্রীয় মসজিদে মোল্লা মৌলবীর দল নামাযের সময় চোরাগোপ্তা হামলা করলে মারাত্মক আহত হয় ইমাম সহ মুসল্লীগণ। লাইব্রেরীতে আগুন ধরিয়ে দিলে লক্ষ লক্ষ টাকার মূল্যবান কিতাবাদি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, এমনকি আল্লাহ্‌র কুরআন পর্যন্ত রেহাই পায়নি। ২৮ মে ২০০৪ তারিখ চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত দখল করার জন্য আসে কয়েক হাজার মোল্লা মৌলবী আযান দেওয়ার সাথে সাথে মারে ইটপাটকেল বাধা দিতে হিমশিম খায় কয়েক ডজন পুলিশ। ১৯৯৯ সালের ৮ই অক্টোবর জুমুআর দিনে টাইম বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শহীদ করা হয় ৭ জনকে আর আহত হন ইমামসহ বেশ কয়েকজন আহমদী। ১৭ এপ্রিল ২০০৫ সুন্দরবন মসজিদ দখল করার জন্য আসে মৌলবাদীরা। তাদের হাতে ছিল লাঠি আর ইট পাথর তারা এসব অস্ত্র দিয়ে যেভাবে সন্ত্রাসী কায়দায় আক্রমণ করেছিল, যা আইয়েমে জাহেলিয়াতের যুগকেও হার মানায়। সেদিন সুন্দরবনে নারী পুরুষের আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যায়।

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ, কারো দলের বিশ্বাস নিয়ে এভাবে জ্বালাও পোড়াও, ঘেরাও করা দখল করা লুট করা হত্যা, বয়কট ইত্যাদি কি নাউযুবিল্লাহ্‌ কুরআনের শিক্ষা না মহানবী (সা.)-এর না সাহাবাগণের? তবে সত্য জামা'ত বা দলের উপর এরকম যে হবে তা নির্ধারিতই বটে। নতুবা মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ অমোঘ বাণী কার উপর প্রযোজ্য? যেমন আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেন, তোমরা কি ধারণা করছ যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদের উপর এখনো তাদের অবস্থা আসেনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গিয়েছে। (সূরা বাকারা : ২১৫)

সুতরাং কলংকের বোঝা আর না বাড়িয়ে বিশেষভাবে স্মরণ রাখুন, আল্লাহ্‌ পাক অহংকারীকে সমূলে ধ্বংস করেন আর বিনয়ীকে কবুল ও পছন্দ করেন। তাই যে অহংকারী মেযায ও যে হাতে হয়েছে এত বড় অমানষিক কর্মকান্ড।

সে হাতকে বিনয়ী ভাবে খোদার দরবারে তুলে দিয়ে অশ্রুভেজা একটি বার বলুন, হে আল্লাহ্‌ এই ইমাম মাহ্‌দী (আ.) দাবীদারক যদি তোমার পক্ষ হতে পাঠিয়ে থাক তবে আমাকে আর বঞ্চিত করে রেখো না আর যদি মিথ্যাবাদী হয় আমাকে ও সারা মানবজাতিকে তাঁর থেকে দূরে রাখ। আল্লাহ্‌ আমাদের এ মিনতী কবুল কর, আমীন। লা নাতুল্লাহি আলাল কাযিবীন।

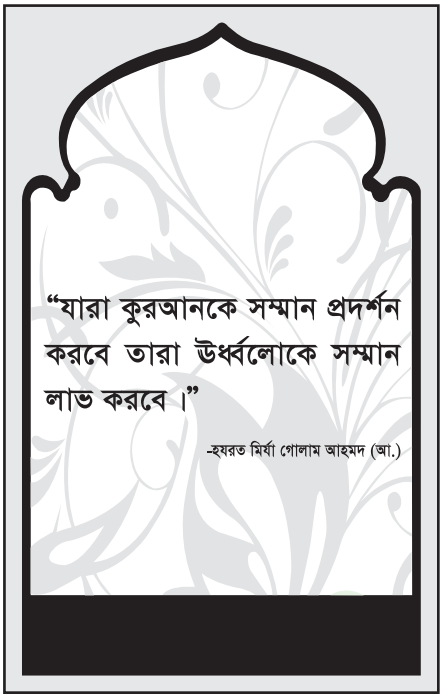

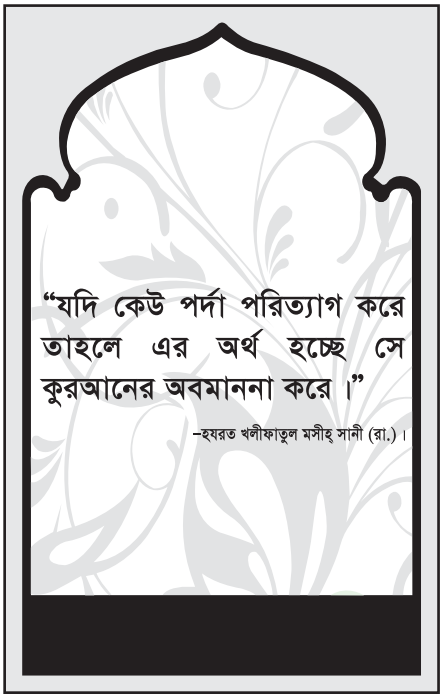

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

প্রতি সংখ্যার পাঠক কলামে লিখার জন্য একটি নির্দ্ধারিত বিষয় উল্লেখ থাকবে।

এবারের পাঠক কলামের বিষয় **'ইসলামে সামাজিক কদাচার পরিহার সম্পর্কিত শিক্ষা'।**

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।

লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ জুন ২০১১-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **'সমগ্র বিশ্বে একক নেত্রীত্বের প্রয়োজনীয়তা'** পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

সমগ্র বিশ্বে একক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

বিশ্ব আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। এটাকে সত্য বলে অস্বীকার করার উপায় নেই, কারণ স্বয়ং আমেরিকাই বলছে ইরান পারমানবিক বোমা তৈরী করেছে–ভারতও এ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই, পিছিয়ে নেই পাকিস্তানও। দু'দুটো বিশ্ব যুদ্ধ হয়ে গেছে। জান, মাল স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর এর বিরূপ প্রভাব ভয়ঙ্কর।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর লীগ অব ন্যাশনজ এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর ইউ. এন. ও. গঠন মানব সভ্যতার বিশেষ করে রাজনৈতিক বিশ্বের জন্য বিশেষ অগ্রগতির পদক্ষেপ এবং প্রশংসনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিশ্বের মানুষ এমনকি স্কুলের সাধারণ ছাত্রও এটা বুঝতে পারে যে, ইউ.এন.ও. সহ যাবতীয় সংঘ, সংগঠন কারো ভিত প্রকৃত সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। বরং তল্পী বাহকের ভূমিকাই পালন করে যাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের কথা–সে আরো করুণ। তারা আজ শতধা বিভক্ত।

ইরান ইরাক যুদ্ধ চলেছে বিশ বাইশ বৎসর ব্যাপী। সাদ্দাম ভুল পদক্ষেপ নিয়ে আক্রমণ করেছিল কুয়েত। শয়তানের খপ্পরে পরে প্রায় ধ্বংস হয়েছে। রাশিয়া, আমেরিকা, কোরিয়া, জাপান, চীন, ভারত পাকিস্তান প্রত্যেকেই যার যার কৌশলে গর্বিত। অন্যদিকে আমরা সাধারণ মানুষ দেখছি সত্যি সুন্দর ন্যায় বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেই চলছে। বিশ্বের সব হানাহানি, দলাদলি এটা নয় ওটা–তুমি নয় আমি, বিচার মানি তবে তাল গাছ আমার– সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ এবং এর ভয়াবহ পরিণাম থেকে বাচার একমাত্র পথ হল সমগ্র বিশ্বে একক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেওয়া এবং একক নেতৃত্বের অধীনে চলা।

অবশ্যই সে নেতৃত্ব সত্য ন্যায় বিচার ও মানবতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে–আর তা শুধু আদেশেই নয় কর্মেও তার শতভাগ বাস্তবায়ন দেখাতে হবে। এখন অবশ্যই প্রশ্ন আসবে এ নেতৃত্ব কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? আমাদের মতে এ নেতৃত্ব রাজনৈতিক বিশ্ব দ্বারা স্থাপিত হওয়া সম্ভব নয়–শুধু সম্ভব নয় তাই নয়। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আল্লাহ্‌র গুণাবলী নিজের মধ্যে ধারণ করতে মানুষের জন্য আদর্শ হওয়ার এবং সেই সঙ্গে মানুষকে শান্তি ও সুন্দরের পথে নিরাপত্তা ও সফলতার পথে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্রষ্টার প্রতিনিধিত্বে প্রতিষ্ঠিত করা তথা একক নেতৃত্বের অধীনে সকলকেই অংশগ্রহণ করা। রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টির ও সমাজের উন্নয়নে সীমাবদ্ধ আর ঐশী নেতৃত্ব স্রষ্টার পাঠদানে সম্পন্ন হয়। আর তাই ঐশী নেতৃত্বের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে সে ঐশী নেতৃত্ব আজ আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। খোলা মন নিয়ে নিরপেক্ষভাবে দেখলে প্রত্যেক সত্যান্বেষী হৃদয়ই এর সত্যতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

আমরা আশা করবো শুধু দর্শনের বড় বড় বই-ই না ঘেটে নিজেদের স্বয়ং সম্পূর্ণ বাস্তব এ সত্য উপলব্ধি করার জন্য বিশ্ববাসী চেষ্টা করবে এবং নিরাপদ বিশ্ব গড়ার জন্য ঐশী একক নেতৃত্বের নির্দেশাবলীর অধীনে নিজেদের ধন্য করবে।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর, হবিগঞ্জ

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঐশী নেতৃত্বের বিকল্প নেই

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা ওয়াদা করেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন। যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। (সূরা আন্ নূর : ৫৬) আজ সারা বিশ্বে একক নেতৃত্ব না থাকার কারণে সর্বোপরি সব বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রগুলো এইসব বিশৃঙ্খলার প্রধান শিকার। সারা বিশ্বকে শান্তি ও সুশৃঙ্খল করে তুলতে হলে একক নেতৃত্বের অতি প্রয়োজন।

আর এই একক নেতৃত্বের প্রধান পরিচালক হলেন আল্লাহ্ মনোনীত খলীফা। আমরা দেখতে পাই ঐশী খলীফা কেবল আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তেই আছে। বর্তমান বিশ্বে সকল দেশে একদল জনগণ তাকে অবৈধ ঘোষণা করে, আরেক দল তাকে বৈধ বলে রায় দেন। তাই প্রত্যেক দেশে এই সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের কারণে পৃথিবী কলুষিত হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি তাই শাক্ষী দিচ্ছে। সিরিয়া, মিশর, লিবিয়া ইত্যাদি দেশে এখন সঠিক নেতৃত্বের অভাবে ধ্বংস হচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে বাকী দেশগুলোতে এই বিষ ঢুকে যাবে। অতএব সারা বিশ্বে শান্তি আনয়নের জন্য একক নেতৃত্বের অতি প্রয়োজন।

হাদীসে উল্লেখ আছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করবেন যিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন (আবুদাউদ)। এই হাদীস দ্বারা এটি অনুধাবন করা যায়, এই উম্মত কোন অবস্থাতেই নেতা ছাড়া থাকবে না আর নেতা বা ইমাম ছাড়া চলতে পারে না।

যদি পৃথিবীতে একজন নেতা থাকে এবং তাঁর আনুগত্য সবাই করে তাহলে বিশ্ব ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ আহমদীয়াত। "আহমদীয়া জামা'ত" এক নেতাকে মান্য করে বলেই

তাদের মধ্যে আনুগত্য, শান্তি, সৌহার্দ্য, ভালবাসা বিদ্যমান। হযরত রাসূল করীম (সা.) খলীফার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, যদি তোমরা দেখ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা বর্তমান তাহলে তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও আর এই কারণে যদি তোমার দেহকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা হয় বা তোমার সম্পদ লুট করেও নেয়া হয়। (মুসনাদ, আহমদ ইবনে হাম্বল)।

পৃথিবীতে একক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হযরত রাসূল (সা.) অনুধাবন করতে পেরে সে অনুযায়ী দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। বর্তমানে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত 'ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর প্রতিচ্ছায়া হচ্ছে এই খিলাফত।

তাই বিশ্ব সুশৃঙ্খল ও ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য একক নেতৃত্বের বিকল্প নেই। আল্লাহ্ তাআলা সকলকে ঐশী খলীফাকে মানার তৌফিক দিন।

এস, এম, সানাউল্লাহ্, ঘাটুরা, বি, বাড়ীয়া

অবক্ষয় থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ ঐশী নেতৃত্ব

এ পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সজীব অথবা নিষ্প্রাণ, ফিরিশ্‌তা, পশু, পাখী, আসমান এবং যমীন এমনকি প্রকৃতির শক্তি, নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে থাকে। কিন্তু মানুষ তাদের মহিমা বুঝতে পারে না। তারা আল্লাহ্ কর্তৃক অর্পিত আপন আপন দায়িত্ব পালন করে চলেছে এবং এভাবে তারা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ্ পূর্ণাঙ্গ এবং সম্পূর্ণভাবে ত্রুটি এবং অক্ষমতা থেকে মুক্ত।

আল্লাহ্ তাআলা মানবজাতিকে অনেক সম্মান দান করেছেন এবং মানুষকে, স্থলে ও সমুদ্রে এবং আকাশে আরোহন করার তৌফিক দিয়েছেন। তাদের পবিত্র রিযক দান করেছেন এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সৃষ্টি করে তাদের মধ্য থেকে অনেকের উপর অনেককে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন করীমের সূরা আল আম্বিয়া ৯৩ আয়াতে বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত একই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রভূপ্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর। আল্লাহ্ তাআলা সকল সৃষ্টিকে মানুষের অধিনস্ত করে দিয়েছেন এবং মানুষের সেবার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে "আশরাফুল মাখলুকাত" উপাধি দিয়েছেন, অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আর আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য।

কিন্তু মানুষ তার সৃষ্টির আসল কারণকে ভুলে গিয়ে ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে শুরু করেছে বিভিন্ন ফেতনা ফাসাদ। বর্তমান যুগে পৃথিবীর সকল জাতি সকল দেশের মধ্যে শুরু হয়েছে এক বিশাল অশান্তির ও বিশৃঙ্খলার সমুদ্র। জাতি জাতির বিরুদ্ধে, একদেশ অন্যদেশের বিরুদ্ধে এবং ঈর্ষা, ঘৃণা, ও অন্যায় আচরণ বা অন্যায় বিচারের প্রাচুর্য হয়েছে। যুলুম, অত্যাচার উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হয়েছে এবং অহংকার জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা ইরাক ও ইরানের একাধারে বেশ কয়েক বছরের যুদ্ধ দেখেছি। আরব, ইরাক ও কুয়েদের যুদ্ধ দেখেছি। আবার ইরাক ও আমেরিকার যুদ্ধ দেখেছি, ফিলিস্তিন ও ইজরাঈলের যুদ্ধ দেখেছি এবং আমরা পাকিস্তানের অবস্থাও দেখছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন পর্যন্ত জাতির সর্বশেষ রণ ক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিগত দু'বিশ্ব যুদ্ধ পৃথিবীতে জাহান্নাম সৃষ্টি করেছে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার কথা ভেবে মানব চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। গুজব শুরু হয়েছে। যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, ঘুর্ণিঝড়, সিডর এবং আরও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তা থেকে বাঁচতে হলে মানবজাতির জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে, তাকে সৃষ্টির কারণ জেনে নেওয়া এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমেই ইবাদত করা এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনা এবং আল্লাহ্‌কেই একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক ও মালিক হিসাবে মান্য করা এবং সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র ফয়সালা মেনে নেওয়া। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এসেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে যে খিলাফতে মসীহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বর্তমান তার পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-কে সমগ্র বিশ্বের একক নেতা হিসাবে মান্য করা এবং তাঁর আনুগত্য করা, তাঁকে সাহায্য করা। যিনি বর্তমান সমগ্র বিশ্বের দু'শতটি দেশের আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পরিচালনা করছেন। তাঁর উপর বিশ্বের কোন আহমদীদের কোন ধরনের আপত্তি নেই এবং সকলেই এক বাক্যে তাঁর সকল আদেশ ও নিষেধ মেনে নিচ্ছে।

যদি সমগ্র বিশ্বের মানুষ সকলেই বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌র মনোনীত খলীফার উপর ঈমান আনে তাহলে হয়তো আল্লাহ্ তাআলা মানুষের উপর থেকে পার্থিব জীবনের আযাব দূর করে দিবেন এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

মৌ. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান, আহমদনগর, পঞ্চগড়

জন্ম দিবস পালন করার শিক্ষা ইসলামে নেই

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জন্ম তারিখ উল্লেখ করে কোন দিবস উৎযাপন করার শিক্ষা আমাদেরকে দেন নাই। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি তাঁর জন্ম তারিখে জন্ম দিবস পালন করেন নাই।

অতএব আমরা মুসলমানরা হযরত রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে শিখতে পেলাম। যদিও তিনি সবচেয়ে বড় রাসূল ছিলেন, সবচেয়ে বড় নবী ছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং সর্বশেষ শরীয়তবাহক ছিলেন, সম্পূর্ণতম মানব ছিলেন, আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নৈকট্য প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি যেহেতু তাঁর জন্ম দিবস পালন করেন নাই, করতে বলেন নাই, করতে শিখান নাই তাই আমরাও করি না।

হুযূর (সা.)-এর মৃত্যুর পর খলিফাতুল রাসূল হযরত আবু বকর (রা.) তিনিও তাঁর (সা.)-এর জন্মদিবস পালন করেন নাই। খলিফাদের সুন্নত দ্বারাও এটা সাবস্থ্য হয় না। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে, হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে এবং হযরত আলী (রা.)-এর যুগেও এটা সাব্যস্ত হয় না।

(সূত্র ঃ অনুষ্ঠান সত্যের সন্ধানে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১১)

সং বা দ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ মিরপুরের সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০৩/২০১১ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ মিরপুরের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন নাসেরা আকরাম, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, আয়শা মাসুদ। হাদীস পাঠ করেন নাবিলা চৌধুরী। সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, আমাতুন মতিন নাসেরা। ঈমানবর্ধক ঘটনা সম্পর্কে বলেন, কোহিনুর আক্তার। আরবী কাসিদা শুনান ইহসেনা দেওয়ান। আহমদীয়া জামাতের রাসূল প্রেম সম্পর্কে বলেন, মানসুরা আক্তার। বাংলা নযম পেশ করেন আয়শা আমীন। আল্লাহ্‌র প্রতি রাসূল (সা.)-এর প্রেম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, ডা: পারভীন হাকীম আনোয়ার। পরিশেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আলীয়া সিদ্দীকা

খুলানা জামা'তে আঞ্চলিক নও মোবাঈন জলসা-২০১১ অনুষ্ঠিত

গত ২০-০৪-২০১১ তারিখ রোজ শুক্রবার খুলনা অঞ্চলের নও মোবাঈনদের নিয়ে প্রথম আঞ্চলিক নও মোবাঈন জলসা-২০১১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার দারুল ফজলস্থ 'বায়তুর রহমান' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। নও মোবাঈনদের এই জলসা দুই অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশন সকাল ৯.৩০ মি. হতে দুপুর ১২.৩০ মি. পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় অধিবেশন ২.৩০ মি. হতে ৫.৩০ মি. জলসার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জোর জড়সিং এলাকার নও মোবাঈন জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মাজেদ। এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা হতে আগত কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ন্যাশনাল অডিটর জনাব এস, এম, আব্দুল আজিজ, এডিশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নও মোবাঈন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মুমেন এবং খুলনা জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক।

প্রথম অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তাফালবাড়ী এলাকার নও মোবাঈন জনাব মোহাম্মদ তৌহীদ হাসান শিহাব এবং নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মাজেদ। এরপর উপস্থিত সকল নও মোবাঈন ষ্টেজে এসে নিজেদের নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা বয়আতের তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করে তাদের পরিচয় দেন। পরিচয় পর্ব শেষে 'আমি কেন আহমদী হলাম এবং আহমদী হয়ে কি পেয়েছি'-এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেন নও মোবাঈন জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, জনাব এমাদুল জমাদ্দার।

"জীবন্ত নামাযের দোয়া"-এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেন জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর জমাদ্দার। "খিলাফত আহমদীয়ার সত্যতার একাট্য প্রমাণ" এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেন জনাব আব্দুল ওহাব। 'আমরা কেন চাঁদা দেই'-এ বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মুহাম্মদ কবিরুল ইসলাম। 'এমটিএ একটি ব্যতিক্রম চ্যানেল'-এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেন সভাপতি এরপর 'ইসলামে নারীর মর্যাদা'-এই বিষয়ের উপর সাবলিল ভাষায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন খুলনার নও মোবাঈন বোন মিসেস রহিমা খাতুন। বক্তৃতা পর্ব শেষে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২-৩০ মিনিটে জলসার ২য় অধিবেশন শুরু হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ন্যাশনাল অডিটর এ ছাড়া ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এডিশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নও মোবাঈন, খুলনা জামা'তের আমীর আরো ছিলেন মুবাশ্বের মুরব্বী মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ। দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুল ওয়াজেদ এবং বাংলা নযম পরিবেশন করেন তাফালবাড়ী এলাকার নও মোবাঈন জনাব হুমায়ুন আজাদ মিঠু। অত:পর উপস্থিত নও মোবাঈনদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতা পর্বে 'মালী কুরবানী: ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ এবং পরিবারের সদস্যদের পর্দার প্রতি যত্নবান হওয়া আহমদীদের বিবাহ শাদী'-সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সভাপতি জনাব এস, এম, আব্দুল আজিজ। 'দোয়ার গুরুত্ব, নিয়মিত জুমুআর নামায আদায় করা ও নিয়মিত হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি শুনা বা পড়া'-এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মুবাশ্বের মুরব্বী মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ। 'জামা'তের অনুষ্ঠানাদিতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক'-এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান। 'খিলাফতের সাথে সম্পর্ক ও গয়ের আহমদী বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনকে এমটিএ-এর মাধ্যমে হুযূর (আই.)-এর খুতবা শুনানো এবং তবলীগ করা'-এই বিষয়ের উপর দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন খুলনা জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। এরপর এডিশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নও মোবাঈন বক্তব্য রাখেন। শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

আঞ্চলিক নও মোবাঈন জলসার সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জোড়সিং এলাকার নও মোবাঈন জনাব কবিরুল ইসলাম। প্রথম অধিবেশনে খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার নও মোবাঈন, জেরে তবলিগী মেহমানসহ মোট ৫৫ জন এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে সর্বমোট ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

জি, এম, মুশফিকুর রহমান

চানপুর চা-বাগানে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত

গত ০৪/০৪/২০১১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চান্দপুর চাবাগান জামাতের উদ্যোগে চন্ডিছড়া চা-বাগানে নামায ঘরে বাদ যোহর মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসের আলোচনা সভায় জনাব আব্দুল কাদির চৌদুরী সভাপতিত্ব করেন। কুরআন তেলাওয়াত করেন মাহমুদুল হাসান পাপন। নযম পাঠ করেন ছানোয়ার হোসেন চৌধুরী এতে বক্তৃতা করেন আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। মাহমুদুল হাসান পাপন, ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী, রানু বেগম চৌধুরী, আইরিন আক্তার (নাজু), রোজিনা আক্তার, ছাহেরা বেগম। সভাপতির বক্তৃতার পর দোয়া এবং মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্তি করা হয়।

আনোয়ার হোসেন

উথলীতে তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৬/৩/২০১১ তারিখ রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উথলীর মসজিদ প্রাঙ্গনে এক বিশেষ তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্, নায়েব ন্যাশনাল আমীর এর সভাপতিত্বে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব তারেক আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব শাহিনুর রহমান। প্রথমে মিশনারী ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মেহমানদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উথলীর হালকা সন্তোষপুর, দর্শনা, পরানপুর, ঈশ্বর চানপুরসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে যে সমস্ত মেহমান সত্যকে জানার জন্য আগমন করেন তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নগুলো ছিল, নবী আসবে কিনা? ঈসার মৃত্যু, খাতামান নাবীঈন, ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন ও তাঁর সত্যতার উপরে।
কুরআন, হাদীস, ইতিহাস ও যুক্তির আলোকে যথাযথভাবে প্রশ্নগুলোর বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেন মিশনারী ইনচার্জ। আগত মেহমানগন প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে খুশী হন ও বেশ কিছু ব্যক্তি বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন।

পুস্তক সেমিনার

গত ২৯/৪/২০১১ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্ উথলীর পক্ষ থেকে জনাব আব্দুল গফুর রিজিওনাল নাযেম খুলনা এর সভাপতিত্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত পুস্তক 'নূরুল কুরআন'-এর উপর এক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। খাকসার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করি। উক্ত পুস্তকের বিস্তারিত আলোচনা করেন মৌ. মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু, মোয়াল্লেম। পাপের আধিক্য নিয়ে আলোচনা করেন জনাব সরফরাজ আব্দুস সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী। পরিশেষে সভাপতি কিতাবের কিছু বিষয় আলোচনা করেন ও তার দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়।

মুয়াযযেম আহমদ সানী

খুলনা রিজিওনের যয়ীম আলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৫/৩/২০১১ তারিখ খুলনা রিজিওনের ৬ষ্ঠ বার্ষিক যয়ীম আলা /যয়ীম সম্মেলন আল্লাহ্ তাআলার ফজলে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদর, জনাব মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, জনাব আব্দুর রশীদ, কায়েদ মাল, জনাব খালেদ বারী, কেন্দ্রীয় কায়েদ ও জনাব মিজানুর রহমান কায়েদ জিয়াফত, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুসারে সকাল ১০-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে বিকাল ৫-৩০ মি. পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। এতে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র সদর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তিনি উপস্থিত সকল মজলিসের কর্মকর্তাদের বিশেষ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রিজিওনাল নাযেম জনাব আব্দুল গফুর, রিজিওনের বার্ষিক কর্মসূচীর বিবরণ বর্ণনা দেন এবং বিভিন্ন মজলিস ও কর্মকর্তাদের উপরে ন্যাস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও মাননীয় সদরের উক্ত দিকনির্দেশনাবলীর জন্য কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেন। এই সম্মেলনে উপস্থিত মজলিস সংখ্যা ছিল ১০টি। মজলিসগুলো হলো উথলী, খুলনা, সুন্দরবন, পাথরঘাটা, চুয়াডাঙ্গা, বটিয়াপাড়া, শৈলমারী, সর্পরাজপুর, ভবানীপুর নাসেরাবাদ।

মোহাম্মদ আব্দুল গফুর

নাসেরাতুল আহমদীয়া ঘাটুরার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ১৪ এপ্রিল তারিখে নাসেরাতুল আহমদীয়া ঘাটুরার উদ্যোগে নাসেরাত দিবস এর আয়োজন করা হয়। উক্ত দিবস অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন মরিয়ম সিদ্দীকা, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরা। উক্ত অনুষ্ঠানে নাসেরাত ও অন্যান্য কর্মকর্তা মিলে ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তি ঘটে। **জেবিন আক্তার (মমি)**

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র নও মোবাঈন ও তবলিগী সেমিনার-২০১১ অনুষ্ঠিত

নারায়নগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ৪-৩-২০১১ নও মোবাঈন ও তবলিগী সেমিনার সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট দিলরুবা বেগম মায়া-এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত তরজমাসহ পাঠ করেন মরিয়ম বেগম (কবিতা)। অত:পর নও মোবাঈনদের জন্য নসিহতমূলক ভাষণ প্রদান করেন আবেদা চৌধুরী। শিক্ষামূলক বক্তব্য রাখেন দিলরুবা বেগম মায়া। প্রশ্ন উত্তর পর্ব পরিচালনা করেন হামিদা খায়ের। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনা করেন আবেদা চৌধুরী। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৩ জন লাজনা, নাসেরাত ১৩ জন, নও মোবাঈন ৭ জন ও জেরে তবলীগ ২ জন উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

ক্রোড়া লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৭/০৩/২০১১ রোজ রবিবার বেলা ৩ ঘটিকায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার উদ্যোগে নার্গিস আক্তার প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ক্রোড়ার সভানেত্রীত্বে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন নীলুফা বেগম ও তানভীয়া আক্তার জেমী। তারপর ২৩ মার্চ এর তাৎপর্য সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন মুনিরা হক, মাকসুদা মাজহারুল (ইতি), আফসানা আক্তার মমি, নাজমা আহমদ, আঞ্জুমান আরা বেগম। পরিশেষে সভানেত্রী তার মূল্যবান ভাষণ দান করে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের পর দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত দিবসে মোট ৩০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

নার্গিস আক্তার

নূরনগর নব-নির্মিত মসজিদে ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জের আগমন

গত ০৮-০৪-২০১১ রোজ শুক্রবার দুপুর ১২টার সময় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান ও মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ নূরনগর নব নির্মিত মসজিদ পরিদর্শনে আসেন, আলহামদুলিল্লাহ্।
জুমুআর নামায শেষে ন্যাশনাল আমীর নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি নূরনগরের নব নির্মিত মসজিদ দেখে খুবই খুশী হন।
তিনি বলেন, এত অল্প টাকায় এত সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে যা দেখে অন্যদের মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করবে। তিনি তার নসিহতমূলক বক্তব্যে বলেন, আপনারা অত্যন্ত পরিশ্রম করে ও নিজেরা আর্থিক কুরবানী করে মসজিদটি নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের পরিশ্রম ও কুরবানী কবুল করুন, এই দোয়া করেন। তিনি আরো বলেন, মসজিদটি যেন আবাদীতে ভরে যায়। তিনি আরো বলেন, এবার আমি দুই কাতার মুসল্লী দেখে গেলাম। আগামীতে এসে যেন তিন কাতার মুসল্লী দেখতে পাই। লাজনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আপনাদের বাচ্চাদের মসজিদমুখী করুন। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা, খোদ্দাম, আতফাল ও আনসারসহ প্রায় পঞ্চাশ জন উপস্থিত ছিলেন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর দোয়ার মাধ্যমে নসীহতমূলক বক্তব্য শেষ করেন।

ডা. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান (ঝান্টু)

নাটাই জামা'তে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২৩/০৪/২০১১ রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাটাই-এর উদ্যোগে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও রূহানী পরিবেশে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, এমদাদ উল্লাহ্ রুবেল। নযম পাঠ করেন নাজমুল সিকদার ও সানাউল করিম বাবু। বক্তৃতা পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাল্যকাল সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব আহসান উল্লাহ্ সিকদার। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতা এবং তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা নওশাদ, আহমদ মুবাশ্বের মুরুব্বী । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের লক্ষণসমূহ ও সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন জনাব এস, এম, তৌফিক বেলাল। পরিশেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভা সমাপ্তি করা হয়।

আহসান উল্লাহ্ সিকদার

বানিয়াজান লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৩/০৪/১১ তারিখে বানিয়াজান জামা'তে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ৩য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমায় লাজনা নায়েব সদর এবং তাঁর সহকারী যোগদান কনে। উক্ত ইজতেমায় ৩০ জন লাজনা নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।
ইজতেমায় কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা দ্বীনিমালুমাতের পরীক্ষা এবং খেলাধূলা প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। ইজতেমায় সমাপনী ও পুরস্কার বিতরনী অধিবেশনের পর দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মিসেস শারমীন আরিফ

রাজশাহী জামা'তে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৩ মার্চ রোজ বুধবার বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রাজশাহীর 'বায়তুল আউয়াল মসজিদে' মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। আসর নামাযের পর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন শাহ্ মোস্তাফিজুর রহমান এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব এনামুর রহমান সাদাফ।
এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের উপর পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব তৌকির আহমদ চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ আবু রায়হান, জনাব মুন্তাজ আলী, মৌ. এহতেশামুল বশির আহমদ এবং মিসেস সাজলিনা রহমান। উক্ত অনুষ্ঠান দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবার মাঝে মিষ্টি বিরতণ করা হয়। অনুষ্ঠানে মোট ২৪ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আতাউর রহমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২৮/ ০৩/২০১১ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসের সভাপতিত্ব করেন বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন কুর্‌রাতুল আইন।

দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। হাদীস পাঠ করেন রজনী দাউদ। এরপর নযম পরিবেশন করেন শাওন। অমৃতবাণী পাঠ করেন তান্নু, বক্তৃতা পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্ম ও শৈশবকাল নিয়ে আলোচনা করেন জিন্নাতুন্নেছা শরিফ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন সম্পর্কে বলেন মুসলেহা জাফর। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চরিত্র সম্পর্কে বলেন, আফরোজা মতিন। এরপর নযম পরিবেশন করেন তান্নু। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সার্বিক দিক নিয়ে সর্বশেষ আলোচনা করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৬০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মিলা পাটোয়ারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ১১/ ০৩/২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসের সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা দীনা নাসরিন, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন রোকসানা মঞ্জুর। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী।

নযম পেশ করেন আয়শা কোমল (সেতু)। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন নাজমা ইসলাম। মাহমুদা জামিল এবং দীনা নাসরিন। এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ২৮ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র মুসলেহ্‌ মাওউদ দিবস পালন

গত ৪ মার্চ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ চট্টগ্রামের উদ্যোগে মুসলেহ্‌ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। উক্ত দিবসের সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ চট্টগ্রাম। প্রথমেই কুরআন তেলাওয়াত করেন মালাম মামদুদা খালিদ। তারপর সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর হাদীস ও নযম পাঠ করা হয়। হাদীস ও নযমের পর মুসলেহ্‌ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন সুমি আক্তার, আমাতুল মুজীব এবং সালমা আক্তার জুয়েল। উক্ত দিবসে ৬৭ জন লাজনা ও ১৫ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা

চরসিন্দুর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৫ এপ্রিল ২০১১ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ চরসিন্দুরের উদ্যোগে দিনব্যাপী স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সকাল ১০টায় শুরু হয় এবং দুপুরের খাবার ও জুমুআর নামাযের পর ক্লাস শেষ হয়। উক্ত ক্লাসে ১৬ জন লাজনা এবং কয়েকজন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সিলেবাস অনুযায়ী লাজনা সদস্যাগণ ক্লাস পরিচালনা করেন।

-রিপা মাহমুদ

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র নাসেরাত দিবস পালিত

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ১লা এপ্রিল ২০১১ রোজ শুক্রবার সকাল ৯টায় নাসেরাত দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম (মায়া)-এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কাজ শুরু হয়।

উক্ত দিবসের প্রধান অতিথি ছিলেন উম্মে কুলসুম চায়না। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত পাঠ করেন আফরিন আহমদ হিয়া, নযম উর্দু খওলাদীন উপমা। নযম বাংলা আমাতুল হাই। এরপর বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন খাদিজা বেগম, তাসনুভা তাহের তৃণা, মাহমুদা আক্তার লিমা, ফরিদা তাসকিয়া, রেজওয়ানা জামান দিয়া। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত দিবসে লাজনা ৩১ জন, নাসেরাত ২২ জন, শিশু ২১ জন ও মেহমান ৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

-উম্মে কুলসুম চায়না

কটিয়াদীতে তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৭/০১/২০১১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কটিয়াদীর উদ্যোগে তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান। আগত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মৌ. বশির আহমদ ও মোহাম্মদ রুহুল আমীন। এতে উপস্থিত ছিলেন ১৮ জন। দোয়ার মাধ্যমে তবলিগী সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে।

কটিয়াদী জামা'তে মসীহ্‌ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৪/০৩/২০১১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কটিয়াদীর উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদে পালিত হয় মসীহ্‌ মাওউদ দিবস। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হান্নান। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ রুহুল আমীন। বক্তৃতা পর্বে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেন জনাব আব্দুল হামিদ ভূইয়া, জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমীন। শেষে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে ৩১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

-আব্দুল হান্নান

খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘাটুরার উদ্যোগে মসীহ্‌ মাওউদ দিবস পালিত

গত ৩ এপ্রিল রোজ রবিবার বাদ মাগরিব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঘাটুরার উদ্যোগে অত্যন্ত জাঁক জমকপূর্ণভাবে মসীহ্‌ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। এতে সভাপতিত্ব করেন এস, এম, ইব্রাহীম রিজিওনাল কায়েদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. এনামুল হক রনি, জনাব মোহাম্মদ মুছা মিয়া এবং জনাব এস, এম, আরমান। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর লেখনী থেকে একটি উর্দু নযম পেশ করেন জনাব এস, এম নাদিম। নযমের পর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব সজীব আহমদ। বক্তৃতা পর্বে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. এনামুল হক রনি, জনাব মোহাম্মদ মুছা মিয়া হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন, জনাব এস, এম আরমান হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর বয়আতের দশটি শর্ত বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন, জনাব উজ্জ্বল আহমদ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর বিরোধীতা ও বিরোধীদের পরিণাম বিষয়ে অত্যন্ত প্রাণবন্ত বক্তব্য করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি সবশেষে দোয়া পরিচালনা করেন, এতে ১০১ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, আরমান

কৃতি ছাত্রী

* আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও-এর সেক্রেটারী ফাইনান্স জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম-এর ১ম মেয়ে আমাতুল রাফে ২০১১ সনের এস.এস.সি পরীক্ষায় ভিকারুনিসা নুন স্কুল থেকে সকল বিষয়ে A+ অর্থাৎ গোল্ডেন G.P.A-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

সে তেজগাঁও জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব ডা: এম এ রশীদ-এর নাতনী এবং সাংবাদিক মরহুম সৈয়দ আবদুল কাহ্‌হার-এর দৌহিত্রী। আমাতুল রাফে তার রূহানী, উচ্চ শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মাতা-সৈয়দা ফারহানা আহমেদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও

* ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদী পাড়াস্থ মরহুম শহীদুর রহমানের বড় পুত্র ঢাকা জামা'তের মতিঝিল হালকার আনিসুর রহমান এর কনিষ্ঠ কন্যা রাবেয়া বুশরা (কনা), ২০১১ সালের এস.এস. সি পরীক্ষায় (ঢাকা বোর্ড) বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে জি.পিএ-৫ (গোল্ডেন) পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

উল্লেখ্য সে মুরুব্বী সিলসিলাহ্‌ মওলানা বশিরুর রহমান এর ভাতিজি। সে যেন পরবর্তী পর্যায়ে পড়া লেখায় আরও উন্নতি করতে পারে এবং জামা'তের খেদমত করতে পারে এ জন্য সে সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী।

* আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনার মরহুম শহীদ ডা: আব্দুল মাজেদ-এর ছোট মেয়ে তাহেরা মাজেদ এ বছর যশোর বোর্ড থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে G.P.A-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। তার পড়ালেখায় আরো উন্নতির জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মোসাম্মাৎ কোরায়েশা মাজেদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনা